ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে

বুদ্ধদেব গুহ

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

প্রকাশক : শ্রীফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি-২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৫৪

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : সুধীর মৈত্র

প্রথম সংস্করণ : এপ্রিল ১৯৫৪

শান্ত মালিনী

এবং

দুরন্ত সোহিনীকে

ঋজুদা বলল, কি রে? ক্ষিদে পেয়েছে?

—তা একটু একটু পেয়েছে বৈ কি। আমি বললাম।

—তাহলে আয় ঐ বড় শিশু গাছটার তলায় বসি।

ঋজুদা আর আমি প্রকাণ্ড গাছটার নীচে একটা বড় পাথরের উপর বসে পড়লাম।

কেন জানি না, ছোটবেলা থেকেই আমি ঋজুদার দারুণ এ্যাড-মায়রার। ঋজুদার জন্যে আমি সব কিছু করতে পারি। তাছাড়া ঋজুদাই তো আমাকে শিকার শিখিয়েছে, বন-জঙ্গলকে ভালবাসতে শিখিয়েছে; ফুল, পাখি, প্রজাপতি সব চিনিয়েছে।

ঋজুদার সঙ্গে বনেজঙ্গলে ঘুরে না বেড়ালে কখনো জানতে পেতাম না যে, বন্দুকের ট্রিগার টানার চেয়ে, যাদের আমরা সহজে গুলি করে মেরে ফেলি, তাদের চেনা অনেক বড় কথা।

ঋজুদা বিয়ে-থা করেনি। করবেও না।

জঙ্গলে জঙ্গলে কাঠের ঠিকাদারী করে বেড়ায়। পুষ্যির মধ্যে সাত-সাতটা দেশী কুকুর। তাদের নাম রেখেছে সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি।

রাতে চানটান করে ঋজুদা যখন হাত-পা ছড়িয়ে নিজের ঘরে সব দরজা-জানালা খুলে শুয়ে থাকে তখন সেই সাত-সাতটা কুকুর তার ঘরে, তার খাটের চারপাশে ঘুমোয়। কোনোটা বা হাত চাটে, কোনোটা বা পা, কোনোটা কানের পাশে জিভ দিয়ে সুড়সুড়ি দেয়।

আমরা যখন খাচ্ছি, এমন সময় দূর থেকে ডালপালা ভাঙ্গার কড়মড় শব্দ শোনা গেল।

আমি উৎকর্ণ হয়ে রইলাম।

ঋজুদা বলল, ভাল করে খা। ব্যাটারা অনেক দূরে আছে।

তারপরই বলল, কোথায় আছে বল তো ?

আমি বললাম, কি ? হাঁতি ?

ঋজুদা হাসল ; বলল, তুই কি কাবলিওয়ালা ? হাতিকে হাঁতি বলছিস কেন ?

ভাল করে চারধারে চেয়ে একদিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম, ঐদিকে।

ঋজুদা বলল, দূর বোকা। যেদিকে দেখালি, ঠিক তার উল্টোদিকে।

আমরা যেখানে বসেছিলাম, সে জায়গাটা একটা উঁচু পাহাড়ের গায়ে। আমাদের পায়ের নীচে, অনেক নীচে, খাড়া খাদের নীচে একটা পাহাড়ি ঝর্ণা বয়ে চলেছে। আমরা এখন এত উপরে আছি নদীটা থেকে যে, নদীটা প্রচণ্ড শব্দ করে বয়ে গেলেও একটা ক্ষীণ কুলকুল শব্দ ছাড়া অন্য কোনোরকম শব্দ শোনা যাচ্ছে না এখান থেকে।

ঋজুদা আঙুল দেখিয়ে বলল, দ্যাখ, ঐ দূরে ঝর্ণাটার কাছাকাছি কতগুলো বড় গাছের মাথা কারা ঝাঁকাঝাঁকি করছে। দেখতে পাচ্ছিস ?

আমি নজর করে দেখলাম ; বললাম, হাঁ, দেখতে পাচ্ছি।

ঋজুদা বলল, হাতিগুলো ঐ ঝর্ণাটার আশেপাশেই আছে। ডাল ভেঙ্গে ভেঙ্গে পাতা খাচ্ছে।

আমি সবে একটা আস্ত ডিমসেদ্ধ মুখে পুরেছিলাম, আমার প্রায় দম বন্ধ হয়ে এল।

ঋজুদা আমার অবস্থা দেখে হেসে ফেলল। বলল, ক্যাল্‌কে-সিয়ান, কোনো ভয় নেই। তুমিও তোমার খাবার খাচ্ছ, ও বেচারীরাও তাদের খাবার খাচ্ছে। ওদের গলায় গাছের ডাল আটকাচ্ছে না, আর তোমার গলায় ডিম আটকালো কেন ?

আমি লজ্জা পেয়ে, ওয়াটার-বটল্ খুলে তাড়াতাড়ি জল খেলাম ঢকঢক করে।

ঋজুদা আড়াই কাপ চা খেয়ে পাইপটা জমিয়ে ধরিয়েছে, এমন সময় জঙ্গলের পাকদণ্ডী পথ দিয়ে কেউ আসছে বলে মনে হল।

উড়িষ্যার এ সব অঞ্চলে নানা উপজাতি আদিবাসীদের বাস। তাদের সম্বন্ধে কত কি যে জানার আছে, শোনার কাছে, তা বলার নয়। তাদের কথা কেউ লেখে না। লোকেরা শহরের লোকদের দুঃখকষ্টর কথা নিয়ে হৈচৈ করে, মিছিল বের করে, কিন্তু এইসব লোকরা, যাদের নিয়ে আমাদের আসল দেশ, আসল ভারতবর্ষ, তারা যে কত গরীব, তাদের যে কত কষ্ট তা বুঝি কেউ জানেই না!

আমি যদি বড় লেখকদের মত লিখতে জানতাম তাহলে শুধু এদের নিয়েই লিখতাম। এদের নিয়ে বড় লিখতে ইচ্ছে করে, সত্যিকারের সৎ লেখা।

দেখতে দেখতে আমাদের পিছনে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে এসে হাজির। ওরা জঙ্গলের পথে খালি পায়ে এমন নিঃশব্দে চলাফেরা করে যে, শব্দ শুনে মনে হয়, কোনো জংলী জানোয়ার আসছে।

দুজনের পরনেই একটি করে ছোট কাপড়। মেয়েটির পিঠে আবার একটি বাচ্চা (এই এক বছরের হবে) সেই কাপড়টুকু দিয়েই বাঁধা। ছেলেটির কোলে আর একটি বাচ্চা, কিন্তু মানুষের নয়। বিচ্ছিরি কিম্ভূতকিমাকার দেখতে।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি দেখে ঋজুদা বলল, ওটা কি বল তো?

আমি বললাম, কি? তুমি বল।

সজারুর বাচ্চা। ঋজুদা বলল।

আমি বললাম, ওরা কি ওটা খাবে?

ঋজুদা বলল, বিক্রি করার চেষ্টা করবে। ভাল দাম না পেলে নিজেরাই খেয়ে নেবে, আর কি করবে!

ঋজুদা লোক দুটিকে বসাল।

তারপর বাস্কেটের মধ্যে অবশিষ্ট স্যাণ্ডউইচ ইত্যাদি যা ছিল সব ওদের দিয়ে দিল। ওরা যে কি ভাবে চোখ বড় বড় করে ওগুলো খেল তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। ঋজুদা যে ভিখিরীর মত করে ওদের খেতে দিল তা নয়, লোকে নিমন্ত্রিত অতিথিকে যেমন করে খাওয়ায় তেমন করে আদর করে খাওয়াল। ওদের খাওয়া হলে, ওদের দুজনকে একটা একটা করে টাকা দিল।

ছেলেটি আর মেয়েটি কি সব বলতে বলতে চলে গেল।

আমি বললাম, কি বলল ওরা ?

ঋজুদা হাসল ; বলল, ওরা আমাকে এক্ষুনি মরে যেতে বলল।

—সে কি ? তার মানে ?

—তার মানে আমার অনেক আয়ু হোক। ওদের বলার ধরনই এমন।

ওরা চলে গেলে আমরা উঠে পড়লাম। পিকনিক বাস্কেটটা গুছিয়ে নিয়ে পিঠের রাকস্যাকে পুরে ফেললাম।

ঋজুদা উঠে দাঁড়িয়ে রাইফেলটা, দূরবীনটা আর টুপিটা তুলে নিল। তারপর বলল, চল, দেখি তোর ভাল্লুকমশাই কি করছেন।

ভাল্লুকমশাই-এর খোঁজেই তো বেবিয়েছিলাম আমরা ক্যাম্প থেকে সেই ভোরে। এখনো তো তার টিকিটি দেখলাম না।

গতকাল ঋজুদার একজন কাঠ-কাটা কুলীকে একটা বিরাট ভাল্লুক ভরদুপুরে এমনভাবে আঁচড়েছে যে, সে বেচারীকে এখন বাঁচানোই মুশকিল! কালই তাকে অঙুল শহরের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এই অঞ্চলে, হাঁটতে হাঁটতে যেখানে আমরা এখন এসে পৌঁছেছি, সেখানে কতগুলো বড় বড় গুহা আছে। তার মধ্যে নাকি অনেকগুলো ভাল্লুকের বাস। এই ভাল্লুকগুলোকে এখান থেকে তাড়াতে না পারলে এখানে কাঠের কাজ চালানোই মুশকিল।

এবার আস্তে আস্তে পাহাড় ছেড়ে আমরা সামনের সবুজ

সমতল তৃণভূমিতে নেমে এলাম। উপর থেকে যে ঝর্ণাটা দেখছিলাম সেটা এখান দিয়ে কিছুটা পথ গড়িয়ে গেছে।

তৃণভূমিটি বেশী বড় নয়। এই এক হাজার বর্গফিট হবে। তার এক পাশে পাহাড়টা খাড়া উঠে গেছে। এবং সেই দেওয়ালের মত পাহাড়ে পর পর কতগুলো গুহা।

আমাদের সামনে দিয়ে জানোয়ারের একটা চলার পথ, আমরা যে পায়ে-চলা পথটা দিয়ে পাহাড় থেকে নামলাম, সেটাকে কোনা-কুনি ভাবে কেটে গেছে।

ঋজুদা সেই মোড়ে গিয়ে পথটাকে ভাল করে দেখল, তারপর বলল, সত্যিই তবে এখানে ভাল্লুক আছে। ওদের যাওয়া-আসার চিহ্নে পথটা ভর্তি।

তারপর বলল, কথা বলিস না। এই বলে, সেই তৃণভূমির ডানদিকে একটু এগিয়ে গিয়ে, গুহাগুলো ভালমত দেখা যায় এমন একটা জায়গা দেখে, একটা বড় পাথরের আড়ালে আমাকে বসতে বলল। বলল, ভাল্লুক জানোয়ার বড় বিচ্ছিরি। তুই এখানেই বসে থাক রুদ্র। তবে এখান থেকে গুহাটা তোর বন্দুকের পাল্লার মধ্যেই পড়বে। আমি রাইফেল নিয়ে গুহার কাছে যাচ্ছি। আমি গুহার পাশে পৌঁছে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকব। আর তুই এখান থেকে পর পর চারটে গুলি করবি ছর্‌রা দিয়ে গুহার মুখের নীচে। দেখিস, আমাকে মারিস না আবার। ভাল্লুকমশাইরা যদি থাকেন তবে হয় বাইরে বেরোবেন, নইলে আওয়াজ দেবেন। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

এই অবধি বলে ঋজুদা নিঃশব্দ পায়ে ঐদিকে এগিয়ে গেল রাইফেলটা বগলের নীচে বাগিয়ে ধরে।

আমি পাথরের উপরে বন্দুকটা রেখে, গুলির বেল্ট থেকে ছর্‌রা বের করতে লাগলাম। ছর্‌রা বের করে, দুটো বন্দুকের দু' নলে পুরে, দুটো পাশে রাখলাম। একটা বুলেট ও একটা এল-জিও রেডি করে রাখলাম, যদি আমার ঘাড়ে এসে কোনো ভাল্লুক

হুমড়ি খেয়ে পড়ে, তার দাওয়াই হিসেবে।

আমি পর পর দুটো গুলি করলাম।

সেই গুলির শব্দের প্রতিধ্বনি পাহাড়ে পাহাড়ে এমনভাবে ছড়িয়ে গেল তা বলার নয়। এবং সেই শব্দর সঙ্গে হনুমানের ডাকের শব্দ, টি-টি পাখির ডিড-ইউ-ডু-ইট্—ডিড-ইউ-ডু-ইট্ করে কৈফিয়ত চাওয়ার চেঁচামেচিতে মাথা খারাপ হবার যোগাড় হল।

দেখলাম, ঋজুদা মনোযোগ সহকারে সামনে চেয়ে আছে।

এমন সময় খুব একটা চিন্তাশীল মোটাসোটা ভাল্লুক বড় গুহাটা থেকে বেরিয়ে গুহার সামনের পাথরে দাঁড়িয়ে পড়েই একবার ডন মারল। তারপর যখন দেখল, ধারে-কাছে কেউ কোথাও নেই, তখন আকাশের দিকে চেয়ে মেঘ ডাকল কিনা তা বোঝবার চেষ্টা করল। আকাশে মেঘ না দেখে, ও বাতাসে নাকটা উঁচু করে শুঁকল এবং শুঁকতেই বাতাসে বন্দুকের টোটার পোড়া বারুদের গন্ধ পেল।

সঙ্গে সঙ্গে সে পড়ি-কি-মরি করে গুহার মধ্যে ঢুকে যাবার জন্যে এ্যাবাউট-টার্ণ করতে গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঋজুদার ফোর-সিক্সটি-ফাইভ ডাবল-ব্যারেল রাইফেলের গুলি ভাল্লুকটার শরীর এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল। ভাল্লুকটার শরীরের মধ্যে গুলিটা একটা ঝাঁকি তুলেই বেরিয়ে গেল।

ভাল্লুক জাতটাই সার্কাসের জোকারের মত। এ ভাল্লুকটাও মরবার সময় জোকারের মত মরল।

ওর শরীরটা পাথর গড়িয়ে এসে নীচের ঘাসে ধপ করে পড়ল।

ভাল্লুকটা মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুঁই কুঁই কুঁই কুঁই করে আওয়াজ শুনতে পেলাম, ঐদিক থেকে। ভাল করে তাকিয়ে দেখি, কালো রাগবী বলের মত দেখতে দুটো ভাল্লুকের গাবলু-গুবলু বাচ্চা ঐ গুহাটা থেকে বেরিয়ে ওরকম আওয়াজ করছে।

ওগুলোকে দেখেই ঋজুদা চেঁচিয়ে উঠল, খবরদার, গুলি করিস না রুদ্র।

আমি ও ঋজুদা দুজনেই ওদের কাণ্ড-কারখানা দেখতে লাগলাম।

বাচ্চা দুটো পাথরের কোণা অবধি এসে নীচে একবার তাকাল, যেখানে ওদের মা (মা-ই হবে নিশ্চয়ই) পড়ে আছে। পাথরের কোণা অবধি আসতেই তারা তিন-চারবার ডিগবাজী খেল। তারপর প্রথম বাচ্চাটা নীচে একটু ভাল করে তাকাতে গিয়ে হঠাৎ একেবারে চার-পা শূন্যে তুলে পপাত ধরণীতলে। পরের বাচ্চাটাও তার দাদা অথবা দিদির অধঃপতনে অনুপ্রাণিত হয়ে, আমরা যেমন করে সুইমিং পুলে ডাইভ দিই, তেমনি করে উপর থেকে নীচে ডাইভ দিল।

আমি আর ঐ উত্তেজনা সহ্য করতে পারলাম না। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, ঋজুদা, ওদের ধরব ?

ঋজুদা ঐখানেই দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবল, তারপর বলল, ধর্।

যেই না অর্ডার পাওয়া, অমনি আমায় আর দেখে কে ? বন্দুক আর গুলি ঐখানেই ফেলে রেখে বাঁই বাঁই করে আমি ওদিকে দৌড়ে গেলাম। ওখানে পৌঁছে দেখলাম, বাচ্চা দুটো মায়ের পিঠের ওপর একবার উঠছে আবার গড়িয়ে পড়ছে। প্রথম বাচ্চাটা যেটা চার-পা-তুলে পড়েছিল, সেটার বোধহয় চোট লেগেছে কোথাও। সেটা বার বার মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছে। জর্দা-দেওয়া পান খেয়ে কৃষ্ণা পিসীর বিয়েতে আমি যেমন পড়েছিলাম।

আমি দৌড়ে গিয়ে একটাকে কোলে তুলে নিতে গেলাম। কোলে নেওয়া তো দূরের কথা, এত সলিড ও ভারী বাচ্চাটা যে, আমিই মাটিতে পড়ে গেলাম। বুঝলাম, যতক্ষণ ওদের মা এখানে শুয়ে আছে, ওদের এখান থেকে পালিয়ে যাবার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

আবার উপরে তাকাতেই আমার বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে গেল। হঠাৎ দেখলাম, উপরের একটা গুহা থেকে একটা প্রকাণ্ড ভাল্লুক দ্রুত লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে আসছে ঋজুদাকে লক্ষ্য করে।

আমি চীৎকার করে উঠলাম, ঋজুদা !

আমার চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে ঋজুদা ঘুরে দাঁড়াল।

ততক্ষণে সেই অতিকায় ভাল্লুকটা অদ্ভুত একটা উঁক্ উঁক্ চীৎকার করে একেবারে ঋজুদার ঘাড়ে এসে পড়েছে বলা চলে।

ঋজুদা মুখ থেকে পাইপটা বের করার সুযোগ পর্যন্ত পেল না। ঐ অবস্থাতেই রাইফেল তুলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করল।

গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে ভাল্লুকটাও ঋজুদার উপরে এসে পড়ল। ভাল্লুকটা উপর থেকে আসছিল, তাই তার গতির সঙ্গে ভারবেগ



আবার উপরে তাকাতেই আমার বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে গেল

যুক্ত হয়েছিল। ঐ ভারী ভাল্লুকের তীব্র ধাক্কা ও আক্রমণে ঋজুদা উপর থেকে নীচে ছিটকে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে ভাল্লুকটাও। ঋজুদার রাইফেলটাও হাত থেকে ছিটকে পড়ল।

ওদের উপর থেকে ঐভাবে পড়তে দেখেই আমি প্রাণপণে দৌড়ে গিয়ে আমার বন্দুকটা নিয়ে এলাম। ফিরে আসবার সময় দৌড়তে দৌড়তেই গুলি ভরে নিলাম।

কাছে এসে দেখি, ভাল্লুকটা আর ঋজুদা প্রায় দশ হাত ব্যবধানে পড়েছে। ভাল্লুকটা তখনো পায়ে দাঁড়িয়ে ঋজুদার দিকে উঠে



টা প্রকাণ্ড ভাল্লুক দ্রুত লাফিয়ে নেমে আসছে ঋজুদাকে লক্ষ্য করে।

আসবার চেষ্টা করছে দেখে আমি তাড়াতাড়ি ওর কানের কাছে একটা এল-জি মেরে দিলাম। ওর শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

ঋজুদার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখি, শরীরের নানা জায়গা কেটে গেছে। এবং কপালের ডানদিকে একটা জায়গা কেটে গিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে।

ঋজুদা আমাকে কাছে ডাকল।

বুঝলাম, নিজের পায়ে উঠে চলার ক্ষমতা নেই ঋজুদার। ঋজুদা বলল, আমার রাকস্যাকে একটা বাঁশী আছে। বাঁশের বাঁশী। উপরে উঠে গিয়ে ওই বাঁশীটা বাজা, যত জোরে পারিস।

তখন আর কেন-টেন শুধোবার উপায় ছিল না।

দৌড়ে পাহাড়ের গায়ে একটা উঁচু জায়গায় উঠে গিয়ে বাঁশীটা বাজাতে লাগলাম। বাঁশীটা কয়েকবার বাজাতেই জঙ্গলের বিভিন্ন দিক থেকে গম্ভীর গব্‌গবে আওয়াজে ঢাক বাজতে লাগল। দেখতে দেখতে চারদিকের বন-পাহাড় সে আওয়াজে ভরে উঠল।

ঋজুদা হাতছানি দিয়ে আমাকে ডাকল।

আমি ঋজুদার মুখে একটু জল দিলাম ওয়াটার-বটল্ থেকে। পরিষ্কার জলে মুখের রক্ত ধুয়ে দিতেই আবার ফিনকি দিয়ে নতুন রক্ত বেরোতে লাগল। আমার খুব ভয় করতে লাগল।

কিন্তু ভয় বেশীক্ষণ রইল না। দেখতে দেখতে প্রায় পনেরো মিনিটের মধ্যে পাহাড়ের চতুর্দিক থেকে অদৃশ্য সব পাকদণ্ডী পথ বেয়ে কোল্হো, খন্দ্, মালো ইত্যাদি নানা আদিবাসীরা এসে হাজির।

তারাই সঙ্গে সঙ্গে টাঙ্গি দিয়ে বাঁশ কেটে স্ট্রেচার বানিয়ে পাতার গদী করে তাতে ঋজুদাকে শুইয়ে আদর করে বয়ে নিয়ে চলল। অন্য কয়েকজন মরা ভাল্লুক দুটো ও বাচ্চা দুটোকে নিয়ে আসতে লাগল। আমরা সকলে রাস্তায় যেখানে জীপটা রাখা ছিল সেদিকে চললাম।

আধঘণ্টার মধ্যে আমরা ঐখানে পৌঁছে গেলাম কিন্তু মুশকিল

হল—জীপ চালাবে কে? আমি লুকিয়ে লুকিয়ে তখন একটু-একটু গাড়ি চালানো শিখেছিলাম, কিন্তু আমার লাইসেন্স ছিল না। ঐ জঙ্গলে অবশ্য লাইসেন্স দেখবার কোনো লোকও ছিল না, কিন্তু লাইসেন্স থাকলেও অত্যন্ত ভাল ড্রাইভার না হলে ঐ জঙ্গল ও পাহাড়ের রাস্তায় জীপ চালানো সম্ভব নয়।

ঋজুদা ব্যাপারটা বুঝে নিল। তারপর কোল্‌হোদের ভাষায় ওদের বলল, ওকে ধরাধরি করে জীপের ড্রাইভিং সীটে বসিয়ে দিতে।

ড্রাইভিং সীটে বসে, ঋজুদা অনেকক্ষণ পর এই প্রথম হাসল। বলল, কী রে রুদ্র? ভয় পেয়েছিস? কোনো ভয় নেই। হাম্ ঠিক হ্যায়। এই বলে, পাইপটাতে তামাক ভর্তি করে নিল ঋজুদা। আমি দেশলাইটা জ্বেলে ঋজুদার পাইপটা ধরিয়ে দিলাম। তারপর পাইপটা দাঁতে কামড়ে ধরে ঋজুদা জীপ স্টার্ট করল।

সঙ্গের লোকদের মধ্যে জনাচারেক পেছনের সীটে উঠে বসল —তারা কিছুতেই এ অবস্থায় ঋজুদাকে একা ছাড়তে চাইল না।

জীপ চালাতে খুবই যে কষ্ট হচ্ছিল তা ঋজুদার বসার ভঙ্গি দেখে বুঝতে পারছিলাম। পথের ঝাঁকুনিতে তার ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছিল। ভাব দেখে মনে হচ্ছিল যে, ঋজুদার পিঠের কোনো হাড় ভেঙ্গে গেছে। এত যন্ত্রণা হলে কি হবে, ঋজুদার মুখের দিকে যতবার তাকাই, ঋজুদা বলছিল, ঠিক হ্যায়, সব ঠিক হ্যায়! ঘাবড়াও মত্।

আমরা ক্যাম্পে পৌঁছতেই ক্যাম্পের মুহুরীরা এবং ট্রাকের ড্রাইভার অমৃতলাল এগিয়ে এল। এক কাপ গরম চায়ে কিছুটা ব্রাণ্ডি মিশিয়ে ঋজুদার খেতে যা সময় লাগে, তার জন্যে দাঁড়িয়েই আমরা আবার রওয়ানা হলাম।

ঋজুদাকে পাশের সীটে সাবধানে সরিয়ে দিয়ে অমৃতলাল জীপ চালিয়ে চলল অঙ্গুলের হাসপাতালে। ওখানে ছাড়া হাসপাতাল নেই কোথাও কাছে-পিঠে।

হাসপাতালে ঋজুদার কতদিন থাকতে হবে কে জানে?

॥ ২ ॥

সেদিন সকালবেলা আকাশ মেঘলা করেছিল।

ক্যাম্পের আশপাশের জঙ্গল থেকে ময়ূর ডাকছিল, কেঁয়া কেঁয়া করে। ঝিরঝির করে একটা হাওয়া ছেড়েছিল মহানদীর দিক থেকে।

মুহুরীরা সকলেই ভোর বেলা চান করে জঙ্গলে চলে গেছিল। ক্যাম্পের বাখারীর বেড়ার উপর তাদের মেলে দিয়ে যাওয়া নানারঙা লুঙ্গিগুলো হাওয়ায় ওড়াউড়ি করছিল। একটা বাদামী লেজঝোলা কুম্ভাটুয়া পাখি সাহাজ গাছ থেকে নেমে এসে ক্যাম্পের চারধারে লাফিয়ে লাফিয়ে এক্কাদোক্কা খেলছিল, আর কি যেন বলছিল নিজের মনে।

ঋজুদা ইজিচেয়ারে শুয়েছিল।

আমি পাশের চেয়ারে বসে বন্দুক ও রাইফেলগুলো পরিষ্কার করছিলাম।

ঋজুদা এখন প্রায় ভাল হয়ে গেছে। কাল থেকে জঙ্গলে বেরোবে নিয়মিত কাজ দেখাশুনো করতে। এরপর থেকে শিকার-টিকারও একটু-আধটু হতে পারে।

ঋজুদা বলল, ভাল করে পুল-থ্রু দিয়ে টেনে টেনে রাইফেলগুলো পরিষ্কার কর, তারপর তেল লাগা। ওদের যত্ন না করলে ওরা ভারী অভিমান করে, বুঝলি।

আমি ঋজুদার দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছি, এমন সময় একটা ভারী সুন্দর হলদে-কালোতে মেশা পাখি এসে ক্যাম্পের সামনের কুরুম্ গাছটার ডালে বসল।

আমি অবাক হয়ে পাখিটাকে দেখতে লাগলাম।

ঋজুদা আমার চোখ দেখে পাখিটার দিকে চাইল, বলল, কি পাখি জানিস ?

আমি বোকার মত বললাম, না।

ঋজুদা বলল, নাঃ, তুই সত্যিই একেবারে ক্যাল্‌কেসিয়ান—কোলকাতায় থেকে থেকে একেবারে নিরেট ইঁট হয়ে গেছিস্‌। এটা হলুদ-বসন্ত পাখি। নাম শুনিসনি ?

আমি বললাম, নাম শুনেছি, কিন্তু আগে দেখিনি। সত্যি ! কী সুন্দর দেখতে, না ?

ঋজুদা যেন নিজের মনেই বলল, জঙ্গলে যখনি আসবি, চোখ-কান খুলে রাখবি, নাক ভরে নিশ্বাস নিবি, দেখবি, কত সুন্দর সুন্দর পাখি, প্রজাপতি, পোকা, আর কত সুন্দর সুন্দর গাছ লতাপাতা ফুল চোখে পড়বে।

বুঝলি রুদ্র, মাঝে মাঝে ভাবি, চোখ-কান তো আমাদের সকলেরই আছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই তা কাজে লাগাই না।

আমি কিছু বললাম না। চুপ করে রইলাম।

দেখতে দেখতে রাইফেল ত্নটো পরিষ্কার হয়ে গেল। বন্দুকটাতে হাত দিয়েছি, এমন সময় সামনের ডিম্বুলি গ্রাম থেকে কয়েকজন লোক এসে ঋজুদাকে দণ্ডবৎ হয়ে কি যেন সব বলল।

দেখলাম, ঋজুদা ইজিচেয়ারে সোজা হয়ে বসল। তারপর ওদের ভাষায় কড়মড় করে অনেকক্ষণ কি সব কথাবার্তা বলল।

আমি কিছুই বুঝলাম না ওদের ভাষা, খালি "বারা" "বারা" এই কথাটা শুনলাম। কিছুক্ষণ পর ওরা হাত নেড়ে নেড়ে উত্তেজিত গলায় কি আলোচনা করতে করতে চলে গেল।

ঋজুদা বলল, বুঝলি কিছু ?

আমি বললাম, বারা, বারা।

ঋজুদা হাসল। বলল, তাহলে তো বুঝেইছিস্‌। বারা মানে শুয়োর। লোকগুলো বলে গেল যে, সারা রাত ধরে শুয়োরের দল

এসে ওদের ক্ষেত সব তছনছ করে দিয়ে যাচ্ছে, যদি আমি ক'টা শুয়োর মেরে দিই তাহলে খুব ভাল হয়। তাছাড়া শুয়োরের মাংসও ওরা খুব ভালবাসে।

তুমি কি বললে? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ঋজুদা আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল, রুদ্রবাবুর কি ইচ্ছা?

আমার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল; হেসে বললাম, শিকারে যাওয়ার।

ঋজুদা বলল, রুদ্রবাবুর যখন ইচ্ছা, তখন যাওয়া হবে।

তারপর আবার হাসতে হাসতে বলল, তোর দাদা এত বড় বৈষ্ণব, যিনি গায়ে মশা বসলে মশাটি পর্যন্ত মারেন না, আর তাঁর ভাই হয়ে কিনা তুই এতবড় জহ্লাদ হলি? তোর দাদা আমার মুখও দেখবেন না আর। তার ভাইকে আমি একেবারে জংলী করে দিচ্ছি, তাই না?

এমন সময় অমৃতলাল কটক থেকে ট্রাক নিয়ে এল। কটকে কাঠ নামিয়ে দিতে গেছিল সে কাল ভোরে। আজ ফিরে এল।

অনেকদিনের খবরের কাগজ, ঋজুদার জন্যে পাইপের টোব্যাকো, চা, কফি, বিস্কুট, আরো অনেকানেক জিনিষের বাণ্ডিল হাতে করে নামল অমৃতলাল।

এই অমৃতলালকে আমার বেশ লাগে। আমি বলতাম, অমৃত্ দাদা।

ফর্সা, রোগা দাড়িহীন পাঞ্জাবী। বয়স এই তিরিশ-টিরিশ হবে। হাসিটা খুব মিষ্টি আর দারুণ উৎসাহী। শিকারে যেতে বললে তো কথাই নেই। না-খেয়ে না-দেয়ে সে সারাদিন পনেরো-কুড়ি মাইল জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরবে।

অমৃত্ দাদা পায়জামা পাঞ্জাবি আর নাগড়া জুতো পরত ট্রাক চালাবার সময়, মাথায় একটা গামছাও লাগাত। গামছাটাতে রূপোর চুমকির মত কি সব চকমকি লাগানো ছিল।

অমৃত্ দাদা বলত, সম্‌ঝা লোম্বা, ঈ রোলেক্স গামছা।

শিকারে যাবার সময় কিন্তু অমৃত্ দাদার সাজ বহু বিচিত্র হতো। দিনে যদি যেত তো ও একটা হাফ প্যান্ট, বুট-কোশ ও কালো বুট জুতো পরত। এই তিনটি জিনিষই তাকে তার ফৌজী কাকা ভালবেসে কোনোদিন দিয়েছিল। কিন্তু অমৃত্ দাদার কাকার জামা-কাপড় এতই ঢোলা ছিল যে তার মধ্যে দু'জন অমৃত্ দাদা বিনা কষ্টে ঢুকে যেতে পারত। তাই সেই জামা-কাপড়ে ওকে অদ্ভুত দেখাত। আর পায়ে বুটটা এতই বড় হতো যে হাঁটলেই সবসময় খপর্-খাপর্, গবর্-গাবর্ শব্দ হতো।

ঋজুদাও ওকে ঐ জন্যে কক্ষনো শিকারে নিয়ে যেতে চাইতেন না। কিন্তু অমৃত্ দাদা ঐ জামা-কাপড় কিছুতেই ছাড়বে না, ওর মিলিটারী কাকা ভালোবেসে দিয়েছে, ও কি তার অমর্যাদা করে? যতবার বুট পরত, প্রতিবারই বুটের মধ্যে ট্রাকের এঞ্জিন মোছার একগাদা তুলো গুঁজে নিত, যাতে পায়ে ফোস্কা না পড়ে।

রাতের পোষাক ছিল তার আরো বিচিত্র। সারা শরীরে একটা ঢোলাঢালা মেকানিকদের তেল-কালি মাখা ওভার-অল্ পরত, আর মাথায় সেই রোলেক্স গামছা, এবং গায়ে ওয়াটারপ্রুফ। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা যে কোনো সময়ই রাতে শিকারে বেরোলেই ওয়াটারপ্রুফটা গায়ে সে চাপাবেই। আর পায়ে সেই গবর্-গাবর্ বুট জুতো।

খুব মজার লাগত আমার অমৃত্ দাদাকে।

অবকাশের সময় নানা গল্প করত অমৃত্ দাদা আমার সঙ্গে।

বেলা বাড়লে রোদটা যখন কড়া হল তখন চান করতে গেলাম আমি। বারোটা বাজলেই চান করতে যেতে হবে, তারপর ঠিক একটার সময় ঋজুদার সঙ্গে খেতে বসতে হবে।

ঋজুদা রোজ ভোর বেলা চান করে নেয়।

এখানে চান করতে ভারী আরাম। ঋজুদা বলত, সবসময় সারা গায়ে যত পারিস রোদ লাগাবি।

এখানে তো আর বাথরুম নেই। কলও নেই। চান করতে

যেতাম প্রায় তিনশ’ গজ দূরে একটা পাহাড়ের উপরের ঝর্ণায়। ঝর্ণাটার নাম ছিল মিঠিপানি। মিঠিপানির মত সুন্দর ঝর্ণা আমি খুব কম দেখেছি।

হাতে সরষের তেলের শিশি ও জামা কাপড় তোয়ালে নিয়ে চলে যেতাম পাহাড়টাতে। যেখান থেকে ঝর্ণা নেমেছে সেটা ঠিক পাহাড় নয়, একটা টিলামত, সেই টিলাই পরে উঁচু হয়ে উঠে গেছে বড় পাহাড় হয়ে।

সে জায়গাটাতে বিশেষ গাছগাছালি ছিল না। একটা সমান চেটালো কালো পাথরের উপর দিয়ে ধাপে ধাপে বয়ে গেছে মিঠিপানি ঝর ঝর করে। এক-একটা ধাপের নীচে গর্ত হয়েছে পাথর ক্ষয়ে ক্ষয়ে—সেই সব গর্তে প্রায় এক কোমর জল। উপর থেকে সমানে জল পড়ায় জল স্বচ্ছ ও পরিষ্কার।

এই জলধারাটা সমানভাবে একটু বয়ে গিয়ে নীচে, বেশ নীচে লাফিয়ে পড়েছে একটা বড় ঝর্ণা হয়ে। তারপর মিঠিপানি নদী হয়ে গড়িয়ে গেছে ডিগ্বলি গ্রামের দিকে।

ঝর্ণাটা যেখানে নীচে পড়ে নদী হয়েছে সেখানে একটা বড় গর্ত। জল বেশ গভীর। সেখানে গাঁয়ের লোকেরা, মেয়ে-বউরা, গরু-মোষরা সব চান করতে আসে।

কিন্তু আমরা যেখানে যাই চান করতে, সেখান থেকে ঐ জায়গা দেখাই যায় না। কারণ আমরা থাকি টিলার মাথায়। আর টিলাটা একেবারে খাড়া নেমে গেছে ঝর্ণার সঙ্গে, তাই নীচ থেকে কোনো লোক এদিকে আসেও না।

এইখানে পাথরের উপরগুলো পরিষ্কার। মাঝে মাঝে শুধু কি সব বুনো ঝোপ—বেগুনী বেগুনী ফুল ফুটে আছে তাতে। বেশ লাগে দেখতে। পাথরের উপরে সবুজ গাছের ঘন ঝোপ—আর মাঝে মাঝে জল বয়ে চলেছে ঝর ঝর করে।

ঋজুদা বলেছিল, এখানে লজ্জা-শরমের কিছু নেই। ঝোপের আড়ালে সব জামাকাপড় খুলে ফেলে সমস্ত শরীরে অনেকক্ষণ

ধরে সর্ষের তেল মাখবি বসে বসে। তারপর পাথরের উপর শুয়ে থাকবি এখানে উপুড় হয়ে. তারপর চিত হয়ে, দেখবি সমস্ত শরীর রোদ লেগে কেমন গরম হয়ে ওঠে। তারপর ঝর্ণায় চান করে জামাকাপড় পরে ক্যাম্পে ফিরবি।

শুধিয়েছিলাম, তুমিও কি তাই কর?

ঋজুদা বলেছিল, নিশ্চয়ই। তুইও কর্-না। এমন আরামে চান করলে দেখবি কোলকাতায় গেলে এই ক্যাম্পের জন্যে কেমন কষ্ট হয় তোর।

প্রথম প্রথম লজ্জা করত। ক্যাম্পের দিক থেকে যদি কেউ চলে আসে? কিন্তু ক্যাম্পের সকলেই ভোরবেলা চান করে নিত, তখনই রান্নার জল নিয়ে নিত, কাপড়-টাপড় কেচে নিত এখানে পাথরে বসেই; তাই দুপুর বেলায় আমার চানের সময় কেউই আসত না এদিকে। তাছাড়া, ক্যাম্পের সব লোক তো কাজেই বেরিয়ে পড়ত সাত-সকালে।

বেগুনী ফুলে ছাওয়া ঝোপের পাশে পাথরে জামাকাপড় ছেড়ে সারা শরীরে তেল মাখতাম। মাঘ মাস, প্রথমে হাত-পা বেশ কনকন করত। কিন্তু সর্ষের তেল মাখতে মাখতে রোদ আর পাথরের গরমে একটু পরেই শরীর গরম হয়ে যেত। উপরে তাকিয়ে দেখতাম যতদূর দেখা যায়—নীল, দারুণ নীল আকাশ। চতুর্দিকে ঘন গহন জঙ্গল। বড় বড় ডালে বাদামী-রঙা কাঠবিড়ালিগুলো লাফালাফি করে পাতা ঝাঁকাত। কত কি পাখি ডাকত দু'পাশ থেকে। পাহাড়ের মধ্যের জঙ্গল থেকে ডিম্বুলি গ্রামের মোষেদের গলার কাঠের ঘণ্টা বাজতো ডুঙ্ডুঙিয়ে। মোষগুলো খুব কাছে চলে এলে, আমার লজ্জা করত, আমি আঙ্গাপাঙ্গা হয়ে থাকতাম, তাই মোষগুলো বড় বড় চোখ করে আমার দিকে তাকালে প্রথম প্রথম আমার খুব লজ্জা করত। কিন্তু সত্যি বলছি, দারুণ লাগত।

কেউ কোথাও নেই—কি সুন্দর শান্তি চারদিকে। মাথার উপরে নীল ঝকঝকে আকাশ, পায়ের নীচে কালো চেটালো পাথর

আর লাফিয়ে-লাফিয়ে চলা ফেনা-ছিটানো বহুবিভক্ত ঝর্ণা, আর চতুর্দিকে গভীর সবুজ বন।

মধ্যে আমি আঙ্গাপাঙ্গা, একা।

ঋজুদা বলত, বুঝলি রুদ্র, আমাদের আসল মা কিন্তু এই আকাশ, পাহাড়, নদী, এই প্রকৃতি। আমি জানি, ছোটবেলায় তোর মা মরে গেছেন, তাই তোর কষ্ট। কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। তবে তুই যদি এই মাকে ভালোবাসতে পারিস তবে দেখবি কত ভালো লাগে।

ঋজুদার কোনো কারণে মন খারাপ থাকলে বলত, জানিস, আমি এদের সবাইকে বলি যে, আমি যেখানেই মরি না কেন, তোরা আমাকে জঙ্গলে এনে কবর দিয়ে যাস। পোড়াস না আগুনে। চারদিকে গাছ-ঘেরা একটা দারুন সূর্যালোকিত জায়গায়, পাখির ডাকের মধ্যে, হাওয়ার শীষের মধ্যে তোরা আমাকে কবর দিয়ে রাখিস।

তখন ঋজুদার কথা শুনতে শুনতে চোখে জল এসে যেত।

ঋজুদা সত্যি ভীষণ ভালবাসে জঙ্গল পাহাড়কে। ভীষণ ভালবাসে। ঋজুদার সঙ্গে থেকে থেকে আমিও ভালোবাসতে শিখেছি। আস্তে আস্তে এই জঙ্গল আর পাহাড়ের মধ্যে আমার ছোট্টবেলার হারিয়ে-যাওয়া মাকে খুঁজে পাচ্ছি যেন।

চান করার মাঝে মাঝে জল থেকে উঠে এসে ভেজা শরীরে পাথরের উপরে হেঁটে বেড়াতাম। পাথরের উপর আমার নিজের শরীরের ছায়াকে দৌড়ে তাড়া করতাম। পিছন ফিরে আমার ভেজা পায়ের ছাপ দেখতাম পাথরের উপর। কখনো বা হাত নাড়িয়ে ইংরিজী-স্যারের মত ইংরিজী বলতাম, একা একা, আঙ্গাপাঙ্গা— হাওয়ার সঙ্গে, রোদের সঙ্গে, বনের সঙ্গে।

তখন, সেই সমস্ত মুহূর্তগুলোতে আর সবকিছুই ভুলে যেতাম। আমার মনে হতো আমিই এই পাহাড়, জঙ্গল, ঝর্ণা আর এই আদিগন্ত সবুজ সাম্রাজ্যের রাজা। আঙুল নেড়ে নেড়ে হাওয়ার ধমক দিয়ে দিয়ে ওদের সবাইকে শাসন করতাম।

৩ ॥

জানিসাহীর দিকের জঙ্গলের কূপে কাজ হচ্ছিল।

সেখানে গিয়েছিল অমৃত্ দাদা ট্রাক লোড করতে। ট্রাক লোড করে ক্যাম্পে এসে খাওয়াদাওয়া করে কাল শেষরাতেও আবার কটক রওয়ানা হয়ে যাবে।

অমৃত্ দাদার সঙ্গে ঋজুদার সাতটি কুকুর--সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি সঙ্গে গেছে ট্রাকে চড়ে একটু হাওয়া খেতে।

নি-কে নিয়ে একটু ঝামেলা যাচ্ছে। পরশু দিন নি-বাবু ক্যাম্পের সীমানার পাশেই একটি খরগোশকে দেখতে পেয়ে তাকে তেড়ে যান। তখন সন্ধে হব-হব। পথ ছেড়ে নি-বাবু তো কানখাড়া খরগোশের পিছু পিছু ধেয়ে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে একটা ছোট ফাঁকা মাঠে এসে পড়ল। সেখানেই ছিল খরগোশদের গর্ত। খরগোশ ভায়া তো গর্তে ঢুকে গেল। নি-বাবু জিভ বের করে হাঁপাতে হাঁপাতে এদিক-ওদিক দেখছেন, এমন সময় নি-বাবুর গা-টা কেমন ছমছম্ করে উঠল। লেজটা অজান্তে কেমন গুটিয়ে গেল। হঠাৎ, নি-বাবু দেখলেন, সেই মাঠের ওপাশে ঝোপের মধ্যে কি যেন একটা জানোয়ারের গোল মাথা নড়ে উঠল।

বেলা পড়ে গেছিল, আলোও যাই-যাই; নি-বাবুর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল ভয়ে।

চিতাবাঘের গন্ধ পেয়ে সে তো প্রাণপণে পড়ি-কি-মরি বলে ছুট্।

মজা করার জন্যে কিনা জানি না, চিতাবাঘটাও তার পেছনে একটুক্ষণ ছুটে এসে নি-বাবুকে ভীষণ রকম ভয় খাইয়ে দিয়ে বনের মধ্যের গাছতলায় বসে জিভ বের করে হাঃ হাঃ করে ভীষণ হাসতে লাগল।

এদিকে নি-বাবু দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়ে আসতে আসতে কাঁটায় পাথরে সারা গা ছড়ে ফেললেন। এসে একেবারে ক্যাম্পের বারান্দায় হাত-পা ছড়িয়ে প্রায় অজ্ঞান।

ঋজুদা বলছিল, নি-টা আজ খুব বেঁচে গেল।

জানিস তো রুদ্র, চিতাবাঘের সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য কি!

আমি বললাম, কি?

পোষা কুকুর।

সত্যি? আমি শুধোলাম। তারপর বললাম, তাহলে বাঘের সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য কি?

ঋজুদা বলল, দেশী পোষা ঘোড়া।

আমি বললাম, যাঃ, তুমি ঠাট্টা করছ।

ঋজুদা বলল, আরে! বিশ্বাস কর। সত্যিই তাই।

প্রায় সন্ধে হয়ে এসেছিল।

আমি ক্যাম্পের সামনের রাস্তায় একটু হাঁটতে গেছিলাম। সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি সঙ্গে নেই, তাই বাঁচোয়া, নইলে ওরা সবসময় এমন পায়ে পায়ে হাঁটে না যে, হোঁচট খেয়ে মরতে হয়। আর নি-বাবুটা সবচেয়ে ছোট বলে ও তো সবসময়ই দু'পায়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে। ওর জন্যে হাঁটাই মুশকিল।

এই সন্ধেবেলাটা ভারী সুন্দর লাগে।

শীতকালের সোনালি নরম বেলা পড়ে এসেছে। গাছগাছালির গায়ে একটা হালকা আবছা সোনালি আভা লেগেছে। আভা লেগেছে পথের নরম লাল ধুলোয়। ডিম্বুলি গ্রাম থেকে নানারকম শব্দ ভেসে আসছে। গলায় কাঠের ঘণ্টা দোলানো গরু-মোষগুলো গ্রামে ফিরে যাচ্ছে। তাদের পায়ে পায়ে লাল ধুলোর মেঘ উড়ছে তাদের মাথার উপর। সেই ধুলোর চোখেও সূর্যের আঙুল লেগেছে।

গরু-মোষের গায়ের গন্ধ, ধুলোর গন্ধ, জঙ্গলের বুনো বুনো গন্ধ সব মিলেমিশে এমন একটা গন্ধ উঠছে চারদিক থেকে যে, কি বলব!

গাছে গাছে, ঝোপে-ঝাড়ে পাখিরা নড়েচড়ে সরে সরে বসছে;

রাতের জন্যে তৈরী হচ্ছে। চারপাশ থেকে ঝিঁঝি ডাকতে আরম্ভ করেছে ঝি-ঝি করে। কতগুলো শ্যাওলা-ধরা পাথরের আড়াল থেকে একটা কালো বুড়ো কট্‌কটে ব্যাঙ ঘুম ভেঙ্গে হাই তুলল। নাকি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল! কে জানে? বুড়োর বোধহয় আর কেউই নেই।

দুপুরে চান করার সময় আঙ্গাপাঙ্গা হয়ে পাথরের উপর, জলের উপর দাঁড়িয়ে, যেমন দু'হাত তুলে সূর্যকে ধন্যবাদ জানাই, এখন এই দিনশেষের নরম বেলাতেও মনে মনে সূর্যকে হাত নেড়ে বলি, আবার এসো। তুমি না এলে, না থাকলে সব অন্ধকার, শীতল আর একাকার। তুমি আবার এসো।

রাতের খাওয়াদাওয়ার পর ঋজুদা বলল, কি রে? যাবি না শুয়োর মারতে? চল্, ঘণ্টা দু-তিন বসে চলে আসি।

তাড়াতাড়ি ভাল করে গরম জামা চাপিয়ে, মাথায় টুপী পরে তৈরী হয়ে নিলাম। ঋজুদা একটা বড় পাঁচ ব্যাটারীর টর্চ নিল সঙ্গে আর তার রাইফেল। রাতে নিশানা নেবার সুবিধার জন্যে ঋজুদার রাইফেলে আলো লাগানো আছে। আন্দাজে নিশানা নেবার পর বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে আলোর সঙ্গে লাগানো একটা পাতলা লোহার পাতকে ছুঁলেই আলোটা জ্বলে ওঠে, তখন ঠিক করে নিশানা নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে গুলি করতে হয়।

সঙ্গে আমিও আমার বন্দুকটাকে নিয়ে নিয়েছি। বন্দুকের সঙ্গে ক্ল্যাম্পে টর্চ লাগানো আছে। আসলে বন্দুকটা আমার নয়। ঋজুদারই। ঋজুদা আমাকে আপাততঃ এটা দান করেছে।

আঠারো বছর না হলে কাউকে বন্দুকের লাইসেন্স দেওয়া হয় না।

ঋজুদা কাঁধের উপর একটা কম্বলও ফেলে নিয়েছে। বাইরে জঙ্গলের মধ্যে অতক্ষণ বসে থাকতে হলে খুবই শীত করবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ডিম্বুলি গ্রামের সীমানায় পৌঁছে গেলাম।

গ্রামের মধ্যের পুরোনো মহুয়া গাছতলায় প্রধানের ঘর।

গ্রামের প্রধানকে ডাকতেই সে বেরিয়ে এল। সে এবং আর একটি লোক নিঃশব্দে আমাদের নিয়ে চলল ক্ষেতের মধ্যের ঝোড়াতে, যেখানে আমরা বসব।

ক্ষেতের মধ্যে ছোট্ট একটা খড়ের চালাঘর চারটে খুঁটির উপর বসানো। এত ছোট যে, পাশাপাশি দুজনের কষ্ট করে বসতে হয়। উপরেও খড়, নীচেও খড়।

প্রধানের সঙ্গে যে লোকটি এসেছিল, সে আমাদের দু'জনের মধ্যে একটা কালো হাঁড়ি রেখে দিল। হাঁড়িটাতে হাত লাগতেই হাতে ছেঁকা লাগল। তাকিয়ে দেখি, হাঁড়িটার মধ্যে কাঠকয়লার আগুন।

আগুন জ্বলছে ধিকিধিকি করে অথচ আগুনটা ভিতরে থাকায়, বাইরে থেকে দেখাও যাচ্ছে না। তাই আগুন দেখে জানোয়ারদের ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবার কারণ নেই।

প্রধান এবং লোকটি ঋজুদাকে ফিসফিস করে কি সব বলে গ্রামে ফিরে গেল।

ঋজুদা শুধু একবার বলল, কম্বলটা জড়িয়ে বোস্, খুব ঠাণ্ডা আছে। ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

আমরা দু'জনে নিঃশব্দে সেই খড়ের ছাউনির নীচে বসে রইলাম।

শিশিরে সমস্ত ক্ষেত ভিজে চপচপ করছে। হাঁটতে গেলে প্যান্ট ভিজে যায়।

কৃষ্ণপক্ষের রাত। চতুর্দিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ক্ষেতের উপরের অন্ধকারকে ঘিরে রয়েছে চারপাশের বনের ঘনান্ধকার। মিঠিপানির পিছনের পাহাড়টাকে আকাশের পটভূমিকায় ঠিক একটা হাতীর পিঠ বলে মনে হচ্ছে। উপরে তাকালে দেখা যায় আকাশময় তারাগুলো জ্বলজ্বল করছে। তারাগুলোরও যেন খুব শীত করছে, তাই যেন ওরা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

হঠাৎ একটা কোটরা হরিণ ডেকে উঠল বাঁ দিকের জঙ্গল থেকে। কয়েকবার ভীষণ ভয়-পাওয়া ব্বাক্ ব্বাক্ আওয়াজ করে

ডাকতে ডাকতে পাহাড়তলির জঙ্গলে দৌড়ে বেড়াল।

তারপর সব চুপচাপ। শুধু একটা কুম্ভাটুয়া পাখি আমাদের ক্যাম্পের কাছ থেকে সমানে একটানা ডেকে চলল—গুব গুব গুব গুব।

আধঘণ্টাখানেক পর একটা বড় হায়না এল। হায়নাটা কোথাও যাচ্ছিল। শর্টকাট করার জন্যে বোধহয় এই মাঠের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। হায়না দেখলেই আমার গা কেমন করে ওঠে। যে ক'বার হায়না দেখেছি জঙ্গলে, ততবারই এমন মনে হয়েছে। পিছনের পা দুটো ছোট, কেমন একটা চোর চোর চেহারা, গায়ে বোঁটকা গন্ধ। হায়নাটা একটু করে হাঁটে, একটু করে থেমে দাঁড়িয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক দেখে। অন্ধকারে ওকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল না, তবে জঙ্গলে পাহাড়ে ঘুরতে ঘুরতে চোখ অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে গেলে, অন্ধকারের মধ্যেও জানোয়ারদের আয়তন ও



ঋজুদা যেন কিসের ধ্যান করছে। চোখের পলক পড়ছে না, শরীর নড়ছে না, এমন কি নিঃশ্বাস নিচ্ছে কিনা তাও বোঝা যাচ্ছে না।

চলন দেখে মোটামুটি বোঝা যায়।

হায়নাটা চলে যাবার পর আর কিছুই ঘটল না।

রাতে ভুনি-খিচুড়ি খেয়েছিলাম, মুগের ডালের। নারকোল কুচি আর কিশমিশ দেওয়া। খিচুড়িটা খুব ভাল হয়েছিল। তাই খাওয়াটাও বেশী হয়ে গেছিল। এখন এই ঠাণ্ডায় ঘুম পেয়ে যাচ্ছে।

মাচায় অথবা এরকম ঝোড়াতে বসে যখনি ঋজুদার মুখের দিকে তাকিয়েছি, তখনি আমার মনে হয়েছে, ঋজুদা যেন কিসের ধ্যান করছে। চোখের পলক পড়ছে না, শরীর নড়ছে না, এমন কি নিঃশ্বাস নিচ্ছে কিনা তাও বোঝা যাচ্ছে না। রাইফেলটা কোলের উপর আড়াআড়ি করে শোওয়ানো আছে। নিজে সহজ ঋজু ভঙ্গিমায় বসে আছে।

প্রথম প্রথম ভাবতাম, ঋজুদা বুঝি একদৃষ্টে জানোয়ার দেখে। একদিন জিজ্ঞেস করাতে ঋজুদা হেসে বলেছিল, এই অন্ধকারে জানোয়ার নিজে দেখা না দিলে কি তুই দেখতে পাবি? তাছাড়া ওদের দেখতে পাবার আগেই তো ওদের আসার শব্দ শোনা যায়। তাই চোখ বন্ধ করে থাকলেও বোঝা যায় যে ওরা আসছে, বা এসেছে।

আমি শুধিয়েছিলাম যে, তুমি তাহলে অমন করে বসে আছ কেন?

ঋজুদা হেসেছিল। বলেছিল, ওরকমভাবে অনড় হয়ে না বসলে জানোয়াররা টের পেয়ে যাবে যে, আমরা এখানে বসে আছি। তাছাড়া কি জানিস রুদ্র, একা একা এরকম জায়গায় বসে থাকলে মনের মধ্যে কত কি ভাবনা আসে। তুই এখন ছোট আছিস, বুঝবি না, বড় হলে বুঝতে পারবি, যে-দিনগুলো চলে যাচ্ছে সেগুলোই ভাল। আমার বসে বসে পুরোনো কথা ভাবতে ভালো লাগে; অনেকের কথা, হয়ত ভবিষ্যতের কথাও কিছু ভাবি। ঠিক কি ভাবি, তে কে বলতে পারব না, তবে দারুণ ভাল লাগে ভাবতে।

আমি অবাক হয়ে ঋজুদার মুখের দিকে চেয়েছিলাম। এখন কি ভাবছে ঋজুদা! কার কথা ভাবছে! কে জানে?

বসে বসে আমি বোধহয় খুঁটিতে হেলান দিয়ে ঘুমিয়েই পড়েছিলাম, এমন সময় হঠাৎ আমার হাঁটুতে ঋজুদার হাত এবং আমাদের চারধারে ঘোঁত-ঘাঁত আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ খুলে দেখি, ঋজুদা দু'হাতে রাইফেল ধরে রয়েছে, গুলি করার জন্যে তৈরী হয়ে।

ঋজুদা আমাকে ওখানে বসার আগেই বলে রেখেছিল যে, তৈরী হয়ে থাক্। জানোয়ার এলেই আমি গুলি করার পর তুইও গুলি করবি। ভাল করে দেখে, তবে মারবি। মিছিমিছি আহত করিস না। যাকে মারবি, সে যেন মরে।

আজ ঋজুদা তার ডাবল ব্যারেল রাইফেল আনেনি। এনেছে সিঙ্গল-ব্যারেল ম্যাগাজিন রাইফেল—যাতে পর পর তাড়াতাড়ি অনেকগুলো গুলি ছোঁড়া যায়।

ঋজুদা এবার তৈরী হয়ে নিজের রাইফেলের সঙ্গে লাগানো বাতির বোতাম টিপল।

আমিও বন্দুক সামনে নিশানা করে আলোর বোতাম টিপলাম। দুটি টর্চের আলো সমস্ত ক্ষেতে ছড়িয়ে যেতেই যা চোখে পড়ল, তা বহুদিন মনে থাকবে।

সমস্ত ক্ষেতময় বোধহয় দেড়শ' বুনো শুয়োরের একটা দল ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরা আধঘণ্টা এ ক্ষেতে থাকলে কোনো ফসলের 'ফ'-ও আর অবশিষ্ট থাকবে না। দলের মধ্যে বড় বড় দাঁতওয়ালা প্রায় গাধার সমান উঁচু শুয়োরও আছে, আবার ছোট ছোট স্নুনটুনি মুনটুনি বাচ্চারাও আছে। সকলেরই লেজ খাড়া। মুখ দিয়ে, পা দিয়ে অনবরত বিচ্ছিরি সব ফোঁ-ফাঁ, ঘ্যাঁত-ঘোঁত আওয়াজ করছে।

আমি শুয়োরের দল দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গেছি, এমন সময় কানের কাছে ঋজুদার রাইফেল গর্জে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আমিও একটা বড় দাঁতাল শুয়োরের ঘাড় লক্ষ্য করে গুলি করলাম। গুলি

করার সঙ্গে সঙ্গে শুয়োরটা পড়ে গেল। আমি অন্য শুয়োরের দিকে নিশানা নেব কিনা ভাবছি, ইতিমধ্যে সেই শুয়োরটা মাথা তুলে উঠে পড়ে ভোঁ দৌড় লাগাল।

ঋজুদা ইতিমধ্যে তিন-চারটে শুয়োর ফেলে দিয়েছে। রাইফেলের বোল্ট্ খোলার চটাপট আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, পোড়া কার্তুজের মিষ্টি গন্ধ, নল থেকে একটু একটু নীলচে ধোঁয়া। আর মাঠময় প্রলয় কাণ্ড হচ্ছে। শুয়োরের দলের ধাড়ি, মাদী ও বাচ্চাদের তীক্ষ্ণ চীৎকারে ও চতুর্দিকে ছোটাছুটিতে মনে হচ্ছে, কি যেন একটা দারুণ যুদ্ধ লেগেছে এখানে।

দেখতে দেখতে সব শান্ত হয়ে গেল। শুয়োরের দল নিরাপদে পাহাড়ের নীচের অন্ধকারে ফিরে গেল। মাঠের মধ্যে চারটে বড় বড় শুয়োর পড়ে রইল। সবগুলোই ঋজুদা মেরেছে। আমার শিকার আমাকে ধোঁকা দিয়ে পালিয়ে গেল, তা কি করব? আর সেই ধোঁকায় আমি এমন বোকা বনে গেলাম যে আর গুলিই করতে পারলাম না।



সমস্ত ক্ষেতময় বোধহয় দেড়শ' বুনো শুয়োরের একটা দল ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ঋজুদা শুধোলো, কি রে রুদ্র, পড়েছে? তুই যেটাকে মেরেছিলি, পড়েছে?

বললাম, না। পড়েছিল, কিন্তু উঠে দৌড় লাগিয়েছে।

ঋজুদা বলল, কোন্‌দিকে?

সোজা।

চল্ তো দেখি ব্যাটা কতদূর গেছে। রুদ্রবাবুর শিকার এমনভাবে হাতছাড়া হবে, এটা কি ভাল কথা? তোকে কিনা একটা বিচ্ছিরী শুয়োর ধোঁকার ডালনা খাওয়াবে?

আমি বললাম, এই অন্ধকারে অত বড় আহত শুয়োরকে ফলো করবে, কাজটা কি ভাল হবে?

ঋজুদা বলল, চল্ তো তুই।

আমরা দুজনেই যে যার হাতিয়ারে গুলি পুরে ঘন অন্ধকার পাহাড়তলির দিকে এগোলাম। আমরা যখন ঝোড়া ছেড়ে নামি, তখনই দেখি যে, গ্রাম থেকে একটা মশাল হাতে নিয়ে কয়েকজন লোক ক্ষেতের দিকে আসছে। গুলির শব্দে ওরা বুঝেছে যে শিকার হয়েছে।

আমরা দুজন ক্ষেত ছেড়ে দিয়ে ঝোপঝাড়ের মধ্যে আলো ফেলতে ফেলতে এগিয়ে চললাম। একটু যেতেই আমাদের গরম জামাকাপড় ডালপাতার শিশিরে ভিজে জবজবে হয়ে গেল। আমরা দুজনে পাশাপাশি যাচ্ছিলাম।

আমরা বেশ অনেকখানি এগিয়ে গেলাম কিন্তু আমার শিকার পাওয়া গেল না। এমন সময় আমাদের আলোতে হঠাৎ একজোড়া লালচে-সবুজ চোখ জ্বলজ্বল করে উঠলো।

সামনেই একটি শুকনো নালা। সেই নালার মধ্যে আমরা প্রায় নেমে পড়েছি এমন সময় চোখদুটো দেখা গেল। দেখি, নালার ঐ পাড়ে একটা মরা গাছের গুঁড়ির আড়ালে শরীরটা লুকিয়ে রেখে একটা চিতাবাঘ আমাদের দিকে চেয়ে আছে। একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে আছে যেন। সেই জ্বলজ্বলে ভুতুড়ে চোখের

দিকে চাইতেই বুকের ভিতরটা কেমন যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল। হঠাৎ ঋজুদা আমার কাঁধে হাত দিয়ে বলল, মার রুদ্র, ভয় নেই, আমি তোর পাশে আছি।

কি হয়ে গেল জানি না, আমি বন্দুক তুলে চিতাটার জ্বলজ্বলে দু'চোখের মধ্যে নিশানা নিয়ে দিলাম গুলি চালিয়ে। আর অমনি চিতাটা মারল এক লাফ আমাদের দিকে। আশ্চর্য! আমি ভাবলাম ঋজুদা তক্ষুনি গুলি করবে, ঋজুদা কিছু করল না, শুধু রাইফেল কাঁধে ঠেকিয়ে, দাঁড়িয়েই রইল। সামনে তাকিয়ে দেখি চিতাটা নালার মধ্যে, যেখানে কতগুলো বড় বড় পাথর আছে, সেখানে আছড়ে এসে পড়ল। একটু হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ির



আর অমনি চিতাটা মারল এক লাফ আমাদের দিকে।

আওয়াজ হলো। তারপর সব চুপ। আশ্চর্য! এই সমস্ত ঘটনা ঘটে গেল কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে।

ঋজুদা আমার দু' কাঁধে দু' চড় মেরে বলল, সাব্বাস রুদ্র। যাঃ, তুই তো আজ বাঘ শিকারী হয়ে গেলি। তোর দাদা জানতে পেলে নির্ঘাৎ হার্টফেল করবে।

আমরা একটুক্ষণ পর ওদিকে নেমে গেলাম। যাবার আগে ঋজুদা কয়েকটা পাথর ছুঁড়ে মারল। তারপর বলল, চল্, সব ঠিক হ্যায়।

নালায় ঢুকতে ঢুকতে আমি বললাম, তুমি গুলি করলে না কেন? আমার এত ভয় করেছিল না, আর একটু হলে তো ঘাড়ে এসে পড়ত।

ঋজুদা হাসল; বলল, আরে আমি তৈরীই ছিলাম। তোর গুলিটা একেবারে মগজ ভেদ করে দু'চোখের মধ্যে দিয়ে ঢুকে গেছিল, আর কী করবে সে? তবে, বুঝলি রুদ্র, বাঘ, চিতা কি অন্য যে কোনো বিপজ্জনক জানোয়ারকে কখনো সামনাসামনি গুলি করিস না। একেবারে নিরুপায় না হলে। সবসময় চেষ্টা করবি পাশ থেকে মারতে।

আমরা যখন পাথরগুলোর কাছে পৌঁছে আমার প্রথম শিকারের বাঘটাকে তারিফ করছি, এমন সময় গাঁয়ের লোকরা মশাল নিয়ে টর্চের আলো দেখে দেখে আমাদের কাছে চলে এল। তারা বলল যে, আমাদের কাছে আসার সময় এই দিকের ঝোপে তারা একটা বড় শুয়োর পেয়েছে—সেটা গুলি খেয়েও দৌড়ে এসেছিল অনেকদূর।

ঋজুদা বলল, আলো বাপ্পালো, (ঋজুদা মাঝে মাঝেই মজা করার জন্যে বলে—আলো বাপ্পালো। উড়িয়াতে একথার মানে হলো, ওরে বাবা।) একই সন্ধ্যায় শুয়োর এবং বাঘ মেরে দিলি—নাঃ, তোকে তো দেখছি এবার সমীহ করতে হবে!

আমি রেগে বললাম. ভাল হবে না ঋজদা। কিন্তু মনে মনে

বেশ খুশীই হলাম।

শুয়োরগুলো পেয়ে লোকগুলো ভারী খুশী। কিছুদিন আর কোনো শুয়োর নিশ্চয়ই এ-মুখো হবে না। তাছাড়া কাল ডিম্বুলি গ্রামে যে দারুণ খাওয়াদাওয়া হবে সে তো জানা কথাই। গ্রামের যে প্রধান, সে তখনই আমাদের নেমন্তন্ন জানিয়ে রাখল, আমরা যেন সন্ধেবেলা অবশ্য অবশ্য গ্রামে আসি ওদের ভোজে ও উৎসবে যোগ দিতে।

মশাল-টশাল জ্বেলে আমরা ক্যাম্পের কাছে যখন এলাম তখন অমৃত্ দাদা ডোরাকাটা পায়জামা পরে, মাথায় গামছা জড়িয়ে খড়ের বিছানায় আরামে ঘুমিয়ে ছিল। সে দৌড়ে এসে ঘুমচোখে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, আরে রুদ্দর দাদা, তুমনে ক্যা কিয়া? তুম্‌নে কামাল্ কর্ দিয়া।

সেদিন অনেক রাত অবধি আমার ঘুম এল না। কারণ পরদিন আলো ফুটলেই ঋজুদা বাঘটার ছবি তুলবে। আর বলেছে, বাঘটার সঙ্গে শিকারীরও একটা তুলবে।

৪ ॥

চামড়া-টামরা ছাড়াতে অনেক বেলা হয়ে গেল। শুয়োরগুলো ওরা গ্রামেই নিয়ে গেছিল। দাঁতাল শুয়োরগুলোর দাঁত দিয়ে যেতে বলেছিল ঋজুদা, ওরা দাঁতগুলো ছাড়িয়ে দিয়ে গেছিল। ইয়াব্বড় সব দাঁত।

ঋজুদা বলল, কোলকাতা নিয়ে গিয়ে কার্থবার্টসন হার্পারের দোকানে দিয়ে দিবি, যা বলবি তাই বানিয়ে দেবে ওরা।

কি বানানো যায় শুয়োরের দাঁত দিয়ে? ঋজুদাকে শুধোলাম।

ঋজুদা বলল, অনেক কিছু। টেব্‌লে রাখার পেন হোল্ডার বানাতে পারিস, চাবির রিঙ বানাতে পারিস মধ্যে ফুটো করে নিয়ে, কিংবা জাস্ট স্যুভ্যেনির হিসাবে রেখে দিতে পারিস।

চিতাবাঘের চামড়াটা ছাড়িয়ে নিয়ে তাতে ফিটকিরি-টিটকিরি লাগিয়ে যত্ন করে রেখে দেওয়া হলো। কাল ভোরে অমৃত্‌দাদা কটক যাবার সময় নিয়ে যাবে, সেখান থেকে ঋজুদার এক বন্ধু এটাকে ম্যাড্রাসে পাঠিয়ে দেবে ভ্যান ইনজেন্ এণ্ড ভ্যান ইনজেন্ কোম্পানীতে। ওরা নাকি সবচেয়ে ভাল ট্যান করে শিকারের চামড়া-টামড়া।

ঋজুদা বলল, তাড়াতাড়ি চান করে খেয়ে নে রুদ্র। আমরা খাওয়াদাওয়ার পর টিকরপাড়া যাব, মহানদীর ঘাটে। অনেকদিন মাছ খাওয়া হয়নি, ঘাট থেকে মাছ কিনব। তাছাড়া তোর নয়নামাসীরা ওখানের বাংলোয় আছে। নয়নামাসী আর তোর মেসো। গ্যাখ, যদি ওদের রাজী করাতে পারিস এই জঙ্গলে এসে এক-দু'দিন থাকতে। তোর মেমসাহেব মাসীর কি জঙ্গলে থাকতে ভাল লাগবে?

আমি তো শুনে অবাক। নয়নামাসীরা টিকরপাড়ায় এসে রয়েছে, আর আমি জানি না? কেন, তা বলতে পারব না, নয়নামাসীকে আমার খুব ভাল লাগে। নয়নামাসী ভীষণ মেয়ে-মেয়ে। মেয়েরা যদি ছেলে-ছেলে হয় তাহলে আমার একদম ভাল লাগে না। কবরীপিসী কেমন ছেলে-ছেলে। কবরীপিসীর একটু একটু গোঁফ আছে, কেমন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলে, পিসের সঙ্গে কথায় কথায় ঝগড়া করে, আমার একটুও ভাল লাগে না। নয়নামাসী যদিও আমার আপন মাসী নয়, কিন্তু আমার সব পিসী-মাসীর চেয়ে আমি নয়নামাসীকে বেশী ভালোবাসি। নয়নামাসীর কাছে গেলেই ভাল লাগে।

খাওয়াদাওয়ার পর আমরা জীপে উঠে বসলাম। ঋজুদা আর আমি। আমি আমার বন্দুকটা নিচ্ছিলাম, ঋজুদা বলল, তুই কি আমায় জেলে পাঠাবি? স্যাংচুয়ারীর মধ্যে দিয়ে রাস্তা। কোনো কিছু শিকার করা মানা।

জীপের উইণ্ডস্ক্রীনটা নাবিয়ে দিলাম আমরা, নইলে ভীষণ ধুলো হবে। জীপের পর্দাও খুলে ফেলা হলো, কারণ এখন দুপুরবেলা, রোদটা ভারী আরামের। রোদ খেতে খেতে যাওয়া যাবে।

আমরা রওয়ানা হয়ে পড়লাম। কাঁচা রাস্তাটা গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে ঘনসন্নিবিষ্ট গাছগাছালিতে ভরা পাহাড়গুলোর গা ঘেষে ঘেষে টুল্বকা, পূর্ণাকোট হয়ে টিকরপাড়ার দিকে।

টিকরপাড়া উড়িষ্যার সবচেয়ে বড় নদী মহানদীর একটি ঘাট। এখানে নদী পারাপারের জন্যে নৌকো আছে। মানুষজন, গাড়ি, ট্রাক সব নদী পেরিয়ে যায় এখানে। পূর্ণাকোট থেকে আমরা বাঁয়ে যাব—আর ডাইনে যদি যেতাম তাহলে অঙ্গুল হয়ে ঢেন্‌কানলে পৌঁছে যেতাম।

টুল্বকা থেকে পূর্ণাকোটের রাস্তাটা সত্যিই অপূর্ব। দিনের বেলাতেও গা ছমছম করে, এমন কি গাড়িতে যেতেও। এ পথে

রোজ গাড়ি যায় না। যদি কখনো কোনো ঠিকাদারের কাজ এ অঞ্চলে চালু থাকে তাহলেই যায়। কাজ চালু থাকলেও ট্রাক এ রাস্তা দিয়ে বড় একটা যায় না কটকে, কারণ ঘুর হয়। জানিসাহী হয়ে, আটগড় হয়ে চলে যায় কটক।

পথের মধ্যে ঘাস, বুনো ফুল গজিয়ে আছে। এখানে ওখানে হাতীর ময়লা, লাল ধুলোয় নানা জানোয়ারের পায়ের দাগ। দু'পাশের জঙ্গল এত ঘন যে, ভিতরে ঢুকতে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয়।

ঋজুদার ক্যাম্প থেকে আমরা মাইল তিনেক এসেছি, জীপ চলছে আস্তে আস্তে—এ পথে জোরে যাওয়া সম্ভব নয়। হঠাৎ পথের ডানদিকে একটা ছোট টিলার সামনে ঋজুদা জীপ থামিয়ে দিল। তারপর ঐ টিলাটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, দেখছিস, কী সুন্দর ফুলগুলো! ফিকে নীল থোকা থোকা ফুটে আছে। ওগুলোর নাম গিলিরী। তারপরই বলল, যা তো রুদ্র, কয়েক তোড়া ফুল তুলে নিয়ে আয়। তোব নয়নামাসী চুলে ফুল গুঁজতে খুব ভালবাসে। তোর মাসীকে দিবি—খুশী হবে।

আমি জীপ থেকে নেমে জঙ্গলের ভিতরে ঢুকতেই আমার ভয় করতে লাগল। যদিও দুপুরবেলা, তবুও খালি হাতে এই জঙ্গলে ঢুকতে বড়ই ভয় করে। আস্তে আস্তে টিলাটার উপরে উঠে গিয়ে ফুল তুলছি, এমন সময় টিলার ওপার থেকে একটা জোর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনলাম। ওদিকে তাকিয়ে দেখি, টিলাটার ওপাশে, একফালি সমান জমি। তাতে ঘন সবুজ বড় বড় নরম ঘাস। পিছন দিয়ে একটা পাহাড়ী নালা বয়ে চলেছে তিরতির করে। আর সেই ঘাসের মধ্যে পা-ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একদল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কালো কুচকুচে মোষ। মোষগুলোর ইয়া ইয়া শিং; আর আশ্চর্য, প্রত্যেকটা মোষের কপালের কাছটা সাদা এবং পায়ের কাছে, আমরা যেমন মোজা পরি, যেন তেমনি সাদা লোমের মোজা। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম, তারপর আর থাকতে না

পেরে উৎসাহে চেঁচিয়ে ডাকলাম, ঋজুদা, ঋজুদা !

ঋজুদা পাইপ ধরাচ্ছিল, স্টীয়ারিং-এ বসে—আমার ডাক শুনে মুখ তুলে বলল, কি রে ?

আমি বললাম, একদল দারুণ সুন্দর মোষ।

ঋজুদা বলল, এই জঙ্গলে মোষ ? তারপরই তড়াক করে স্টীয়ারীং ছেড়ে লাফিয়ে নেমে তাড়াতাড়ি আমার দিকে আসতে লাগল ; আসতে আসতে বলল, কথা বলিস না, ওখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক।

ইতিমধ্যে আমার ডাকাডাকিতে ঐ মোষগুলো সব এক জায়গায় হয়ে গেল—একজায়গায় হয়ে গিয়ে সব আমার দিকে মুখ করে মাথা নীচু করে বিরাট বিরাট শিং বাগিয়ে রইল। ওদের নাক দিয়ে ভোঁস ভোঁস করে নিশ্বাস পড়তে লাগল।

ঋজুদা আমার পাশে এসে পৌঁছল। পৌঁছেই বলল, বাইসন।

এগুলোই তাহলে বাইসন, যাদের কথা এত শুনেছি।

ঋজুদা ফিসফিস করে বলল, ছাখ, ভাল করে দেখে নে। তারপর কথা না বলে আস্তে আস্তে নীচে নেমে যা, গিয়ে জীপে বসবি।

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, চল এক্ষুনি যাই, ওরা যদি তেড়ে আসে ?

ঋজুদা আস্তে আস্তে বলল, কিচ্ছু করবে না, ভাল করে দেখে নে। দিনের বেলায় এতবড় বাইসনের দল এমন দেখা যায় না।

আমাদের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ওরা আস্তে আস্তে এক এক করে জঙ্গলের গভীরে ঢুকে গেল ঐ মাঠ ছেড়ে। সবচেয়ে শেষে গেল সবচেয়ে বড় বাইসনটা। ঋজুদা বলল, ছাখ, এই হচ্ছে সর্দার।

বাইসনের দল চলে যেতেই আমরা আস্তে আস্তে নেমে এসে জীপে বসলাম। ঋজুদা জীপ স্টার্ট দিল। বলল, ফুলগুলো ভাল করে রাখ, উড়ে না যায়।

অনেক পাহাড়ের গা ঘেঁষে গিয়ে, অনেক শুকনো শাল সেগুনের

পাতা মচমচিয়ে মাড়িয়ে, অনেক পাহাড়ী নালার তিরতিরানি গান শুনতে শুনতে আমরা পূর্ণাকোটের কাছাকাছি প্রায় এসে গেলাম।

ঋজুদা বলল, কি রে, চা তেষ্টা পেয়েছে?

আমি বললাম, তুমি যদি খাও।

আরে তোর পেয়েছে কি না বল-না?

আমি মুখ ফিরিয়ে হেসে বললাম, পেয়েছে।

ফরেস্ট চেক-পোস্ট পেরিয়ে এসে পূর্ণাকোটের বড় রাস্তায় একটা ছোট চায়ের দোকানে দাঁড়ালাম আমরা। দোকানী ছোট ছোট



ভাল করে দেখে নে। দিনের বেলায় বাইসনের দল এমন দেখা যায় না।

গ্লাস সাজিয়ে চা বানাতে লাগল। আমার মনে হলো পুরোনো মোজা দিয়ে চা ছাঁকছে। ঋজুদাকে বলতেই ঋজুদা আমাকে ধমক দিয়ে বলল, কি করে চা ছাঁকচে তা তোর দেখার দরকার কি? চা পেলেই তো হলো। অন্যদিকে কি তাকাবার কিছুই নেই?

পথের ঐ দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সত্যি চোখ ফেরানো যায় না। দূরের ঐ পাহাড়গুলো আর এই রাস্তার মধ্যে অনেকখানি সমান জমি। ফসল লাগানো হয়েছিল—সমস্ত মাঠটা সোনালী আর হলুদে মেশা একটা গালচে বলে মনে হচ্ছে। মধ্যে মধ্যে শর্ষের চোখ-ধাঁধানো হলুদের ছোপ। এখানে ওখানে ফসল পাহারা দেওয়ার জন্যে তৈরী খড়ের মাচা। মাঠময় বগারী পাখির একটা বড় ঝাঁক দোলা-লাগা কাঁপা কাঁপা মেঘের মত একবার মাটি ছুঁয়ে আবার পরক্ষণেই যেন মাটি ছেড়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছে। রাস্তার পাশের হাসপাতালের কুয়োর লাটাখাম্বাটা উঠছে নামছে। তার ক্যাঁচোর-ক্যাঁচোর শব্দ সমস্ত শান্ত শীতার্ত দুপুরের নির্জনতা একটা গোঙানিতে ভরে দিয়েছে।

চায়ের দোকানী চা নিয়ে এল। আমরা গেলাস হাতে নিয়ে চা খেলাম। তারপর পয়সা মিটিয়ে দিয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম টিকরপাড়ার ঘাটে।

পূর্ণাকোট থেকে টিকরপাড়ার পথের দু'পাশে পাহাড় নেই বটে, তবে জঙ্গল এত গভীর যে দিনের বেলাতে যেতেও গা-ছমছম করে। ধুলোয় ধুলোয় দু'পাশের গাছপালার পাতা লালচে হয়ে আছে।

দুপুরবেলার বনের গায়ে একটা আশ্চর্য গন্ধ আছে। ঋজুদার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে হয়েছে কিনা জানি না, এ ক'দিনেই আমি জঙ্গলের শব্দ, গন্ধ, চেহারা সব খুব খুঁটিয়ে দেখতে শিখেছি। সকালের বনের গায়ের গন্ধের সঙ্গে রাতের কিংবা দুপুরের বনের গায়ের গন্ধ মেলে না; যেমন মেলে না রাতের বনের শব্দের সঙ্গে সকালের বনের শব্দ।

এখানে রাস্তাটা অপেক্ষাকৃত চওড়া ও পথ সমান বলে ঋজুদা বেশ জোরে জীপ চালিয়ে চলল। এখানেও দু'পাশে ঘন জঙ্গল, তবে যে জঙ্গল পেরিয়ে এলাম, তেমন নয়।

টিকরপাড়ার কাছাকাছি আসতেই জঙ্গল পাতলা হয়ে এল। মাঠের চারপাশটা ফাঁকা ফাঁকা। কিছু কিছু ঘরবাড়ি, ছোট ছোট দোকান এই সব।

চুলে লাল নীল রিবন্ দিয়ে ফুলের মত করে ঝুঁটি বেঁধে কালো কালো ছটফটে ঘাসিয়ানি মেয়েরা ঘাটের চারধারে দাঁড়িয়ে-বসে রোদ পোয়াচ্ছে।

ঘাটের পাশে জীপ থেকে নেমেই আমার দু' চোখ জুড়িয়ে গেল। এত সুন্দর দৃশ্য এর আগে কখনও দেখিনি। কী-ই বা দেখেছি ছাই দেখার মত!

দু'পাশে মাথা-উঁচু পাহাড়—ঘন সবুজ জঙ্গলে ভরা। মধ্যে দিয়ে ঘন নীলচে-সবুজরঙা জল বয়ে চলেছে মহানদীর। এখানে মহানদী যে কত গভীর তা কেউ জানে না। ঘাটের কাছে এবং ওপাশে বাদামী-রঙা বালির চর পড়েছে সামান্য জায়গায়। এই জায়গাটুকু ছাড়া মহানদীর এই গণ্ডে কোথাও চর নেই। ঋজুদা বলল, লোকে একে বলে সাতকোশীয়া গণ্ড। চোদ্দ মাইল পাহাড়ে পথ কেটে মহানদী এমনি এক গভীর গণ্ডের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে এখানে। বিন্‌কেই থেকে বড়মূল।

নৌকো করে গাড়ি বা ট্রাক পার করে দেয় ওরা। ঐ পারে পৌঁছে ডানদিকের পথ ধরে জঙ্গলে জঙ্গলে শীতলপানি হয়ে লোকে চলে যায় বৌধ রাজ্যে। চারছক্, ফুলবানী এইসব জায়গায়। আর একটা পথ বাঁয়ে চলে গেছে ছবির মত জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বড়মূল হয়ে, বড়সিলিঙা হয়ে টাক্‌রা—দশপাল্লা রাজ্যে।

গভীর জঙ্গলে ভরা মাথা-উঁচু পাহাড়গুলো নদীর নীল আরসিতে সারা দুপুর মুখ দেখে। পাহাড়ী বাজেরা সারা দুপুর নদীর উপরে ও পাহাড়ের কোলে কোলে ঘুরে ঘুরে ওড়ে। তাদের ক্ষয়েরী

ডানায় দুপুরের রোদ ঠিকরোয়। ঠাণ্ডা জল ছেড়ে মেছো কুমীররা বালিতে উঠে রোদ পোয়ায়। মাছের নৌকো বাদামী পাল তুলে গণ্ডের নীল জলে বড় বড় আঁশের মহাশোল, রুই আর কাৎলা মাছের খোঁজ করে।

মাঝে মাঝে জল বেয়ে হিলজার্স্‌ কোম্পানীর বাঁশ যায় চৌদুয়ারের কাগজের কলে। একসঙ্গে হাজার হাজার বাঁশ লখীন্দরের ভেলার মত ভেসে চলে স্রোত বেয়ে।

গল্পের বইয়ে, ইংরিজী সিনেমায় অনেক সুন্দর এবং ভয়াবহ জায়গার বর্ণনা পড়েছি এবং দেখেছি, কিন্তু আজ এই অপরাহ্নবেলায় ঋজুদার হাত ধরে এমনই এক জায়গায় এসে দাঁড়ালাম যে, এমন কিছু-যে আমাদের দেশেই আছে, এ কথা ভেবে আমার গর্ব হলো। হঠাৎ বুঝতে পারলাম, কী সুন্দর দেশ আমাদের এই ভারতবর্ষ!

কি আশ্চর্য বিচিত্র আর অপূর্ব এর নিসর্গসৌন্দর্য।

ঘাট থেকে দুটো বড় বড় রুইমাছ কিনলো ঋজুদা; বলল, একটা তোর মাসীকে দিবি, অন্যটা আমাদের। অবশ্য তোর মাসী আমাদের সঙ্গে গেলে দুটোই আমরা নিয়ে যাব।

ঋজুদা বলল, চল, এবার বাংলোয় যাই। তোর ফুলগুলো শুকিয়ে যাওয়ার আগে আগে তো নয়নামাসীকে দিতে হবে, তাই না?

বাংলোয় যেতে ঘাট থেকে পিছিয়ে এসে বাঁয়ে যেতে হলো আমাদের।

বাংলোটা ভারী সুন্দর। একেবারে নদীর উপর।

জীপটা বাংলোর হাতায় ঢুকে যখন বাংলোর সামনে দাঁড়াল তখন দেখলাম, মেসো আরো তিন-চারজন ভদ্রলোকের সঙ্গে গাছতলায় রোদ্দে সতরঞ্জি পেতে বসে তাস খেলছে। আর নয়না-মাসী একা, দূরে, একটা গাছতলায় চেয়ার পেতে বসে আছে নদীর দিকে চেয়ে।

ঋজুদা মেসোদের কাছাকাছি যেতেই মেসো চিনতে পেরে বলল, আরে কি ব্যাপার, ঋজুবাবু যে! বসে পড়ুন, বসে পড়ুন, আরে

মশাই, আমরা দিনের মধ্যে বাইশঘণ্টা তাস চালাচ্ছি এখানে। তাস খেলার এমন জায়গা ভূ-ভারতে নেই।

ঋজুদা হেসে বলল, মাপ করবেন, ঐ খেলাটা আমি শেখবারই সুযোগ পাইনি।

মেসো বলল, বলেন কি? জীবনে তাহলে করলেন কি? তাহলে যান মিসেসের সঙ্গে গল্প করুন। চা না খেয়ে যাবেন না কিন্তু। এখানে এরা এমন তন্ময় হয়ে খেলছে এখন যে, এদের রসভঙ্গ না করাই ভাল।

সঙ্গের ভদ্রলোকেরা আমাদের দিকে ভাল করে তাকালেনও না। দেখলাম, মাঝখানে একটা ডিসের উপর অনেকগুলো টাকা চাপা দেওয়া।



তুই তো ভারী মিষ্টি ছেলে হয়েছিস্। কোথায় পেলিরে ফুলগুলো? কি নাম?

ততক্ষণ নয়নামাসী আমাদের দেখতে পেয়েছিল। দেখতে পেয়ে এদিকে আসছিল। আমি দৌড়ে গিয়ে ফুলগুলো দিলাম।

মাসী আমাকে আদর করে বলল, বাঃ বাঃ, তুই তো ভারী মিষ্টি ছেলে হয়েছিস। কোথা থেকে পেলি রে ফুলগুলো? কি নাম?

আমি কৃতিত্বের সঙ্গে বললাম, গিলিরী। ঋজুদা পাড়তে বলেছিল তোমার জন্যে। তারপরই বললাম, জানো মাসী, আজ বাইসন দেখলাম।

বাইসন? সত্যি!

আমি বললাম, সত্যি। তারপর বললাম, মাসী, তোমাদের জন্যে ঋজুদা মাছ এনেছে। খাবে তো?

মাসী হাসল, আমাকে আদর করে বলল, খাব না কেন?

ঋজুদাকে আসতে দেখে মাসী প্রথমে মুখ নামিয়ে নিল, যেন দেখেইনি।

আমার মনে হলো, মাসীর সঙ্গে ঋজুদার নিশ্চয়ই এর আগে কখনো খুব ঝগড়া-টগড়া হয়েছিল। নইলে কাউকে দেখে কেউ মুখটা অমন করে?

তারপর হঠাৎ মাসী মুখ তুলে হেসে বলল, তারপর ঋজুদা, কি মনে করে! পথ ভুলে এলেন বুঝি?

ঋজুদা হাসল। হাসলে ঋজুদাকে ভারী ভাল লাগে।

ঋজুদা বলল, পথ ভুলে কেন? আমার এই-ই তো পথ। এ ছাড়া অন্য পথ তো নেই। এ পথেই যাওয়া-আসা।

তারপর হঠাৎই বলল, তুমি কেমন আছ বলো?

মাসী একবার মেসোদের দিকে চোখ তুলে দেখল, তারপর বলল, ভাল। খুব ভাল। দেখতেই তো পাচ্ছেন। খারাপ আছি বলে মনে হচ্ছে কি?

ঋজুদা বলল, জানি না, আমার নিজের দেখার চোখ থাকলে তো দূর থেকেই দেখতে পেতাম।

এমন সময় আমি বলতে গেলাম, মাসী, তোমাদের আমরা নিয়ে যাওয়ার জন্যে এসেছিলাম, কিন্তু আমি কথা আরম্ভ করার আগেই ঋজুদা আমাকে চোখ দিয়ে ধমকে দিল। কিন্তু কেন, তা আমি জানি না।

মাসী বলল, আপনি কিন্তু খুব রোগা হয়ে গেছেন ঋজুদা। অনেকদিন পরে দেখলাম আপনাকে।

ঋজুদা জবাবে কিছু বলল না, নদীর দিকে চেয়ে রইল।

মাসী বলল, আপনারা বসবেন না? বসুন। এতদূর থেকে এলেন, এখানে রাতে খেয়ে যেতে হবে কিন্তু। কি রে রুদ্র? থাকবি না?

ঋজুদা বলল, জঙ্গলের গেট বন্ধ হয়ে যাবে যে একটু পরে। দেরী করা যাবে না নয়না।

নয়নামাসী একটু রাগ-রাগ গলায় বলল, এমন ভাবে আসার কি মানে হয়? না এলেই হতো।

ঋজুদা আবার হাসল; বলল, হয়ত তাই। না এলেই হয়ত হতো। তবু এলাম। এলাম বলে দেখা হলো তোমার সঙ্গে। কি? তাই না?

এবার মাসী আমার দিকে চেয়ে বলল, রুদ্র, তুই যা তো, গিয়ে ছাখ, চৌকিদার কি করছে। চৌকিদারকে ডেকে নিয়ে আয় তো। লক্ষ্মী ছেলে।

আমি চলে গেলাম। কিন্তু আমার মন বলল, চৌকিদার ব্যাটা উপলক্ষ। কোনো কারণে মাসী আমাকে তাড়াতে চাইছে। কেন যে তাড়াতে চাইছে সেটা বুঝতে পারলাম না।

চৌকিদারবাবু ঘুমোচ্ছিলেন। তাঁকে ঘুম থেকে ডেকে নিয়ে আমি যখন ফিরলাম, দেখি ঋজুদা চলে এসে জীপের কাছে পৌঁছে গেছে। মাসী জীপের স্টীয়ারিং-এর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। মাসীর মুখটা খুব শুকনো দেখাল। মনে হলো, মাসী যেন কাঁদছে।

আমি বললাম, মাসী, এই যে চৌকিদার।

মাসী বলল, তোর ঋজুদা একটুও বসতে পারবেন না, আর চৌকিদারকে দিয়ে কি করব বল ? তারপরই চৌকিদারকে বলল, চৌকিদার, আমার ঘরে ঢেন্‌কানল থেকে আনা পোড়-পিঠের একটা ঠোঙ্গা আছে, নিয়ে এসো-না।

চৌকিদার ঠোঙ্গাটা আনতেই মাসী আমার হাতে ওটা দিয়ে বলল, রুদ্র, এটা তোরা নিয়ে যা। জঙ্গলে দিনের পর দিন কি খাস রে ?

আমি হাসলাম ; বললাম, কত কি খাই !

ঋজুদা বলল, চল রুদ্র, উঠে পড়।

স্টীয়ারিং-এ বসে ঋজুদা মেসোদের দিকে হাত নাড়ল।

মেসো বাঁ হাতে তাস ধরে, সিগারেট মুখে দিয়ে ডান হাত নাড়ল, তারপর সিগারেটটা মুখ থেকে নামিয়ে বলল, সাংঘাতিক জিতছি, জিতছিই ; এখন আসা সম্ভব নয়। ডোণ্ট্ মাইণ্ড। প্লিজ। সী-ইউ।

ঋজুদা মাসীর দিকে চেয়ে শুধোল, গজেন কি বলল ? জিতছে ?

মাসী ডান হাতে কপালে-পড়া চুল ঠিক করতে করতে বলল, সাংঘাতিক জিতছে।

ঋজুদা এঞ্জিনটা স্টার্ট করল। স্টীয়ারিং-এ রাখা ঋজুদার হাতের উপর আঙুল ছুঁইয়ে মাসী বলল, পরশু কোলকাতা ফিরব, চিঠি লিখবেন, কেমন ? লিখবেন তো ?

ঋজুদা উত্তর দিল না, শুধু মুখ ঘুরিয়ে একবার মাসীর দিকে তাকাল। তারপর জীপ ব্যাক করে নিয়ে ঋজুদা একসিলারেটরে ভীষণ জোরে চাপ দিয়ে খুব স্পীডে গাড়ি চালাতে লাগল। সময় মত যেতে না পারলে জঙ্গলের গেট বন্ধ হয়ে যাবে। রাতে আর ফেরা যাবে না ডিম্বুলিতে।

আমার মনে হলো, ঋজুদার বোধ হয় ভীষণ দেরী হয়ে গেছে।

ফেরার পথে সারা রাস্তা ঋজুদা কোনো কথা বলল না আমার

সঙ্গে। মাঝে মাঝে কি যে হয় ঋজুদার, সে-ই জানে। পাইপটা ভরবার জন্যে শুধু একবার একটা নালার পাশে দাঁড়াল—তারপর সারা রাস্তা আর একবারও দাঁড়াল না।···

আমরা প্রায় ক্যাম্পের কাছে পৌঁছে গেছি, ক্যাম্প থেকে পাঁচশ মিটার দূরে একটা বাঁক আছে মারাত্মক। একটা সাঁকো—কাঠের। একেবারে নড়বড়ে। সাঁকোটা পেরিয়েই পথটা হঠাৎ কোনাকুনি ঘুরে গেছে বাঁয়ে। সেই বাঁকটা ঘুরতেই আমার মনে হলো, সামনে পথটা হঠাৎ বুঝি শেষ হয়ে গেছে—আর পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা পাহাড়।

কি হলো বোঝার আগেই ঋজুদা জোরে ব্রেক কষল। জীপের হেডলাইটের আলোতে দেখলাম, পথ জুড়ে একটা হাতী দাঁড়িয়ে আছে। একা হাতী। হাতীটা পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল। জীপটা তার কাছে গিয়ে পৌঁছতেই হাতীটা অতবড় শরীরটা ঘুরিয়ে আমাদের দিকে মুখ ফেরাল।

আমি ঋজুদার দিকে মুখ ফেরালাম, দেখলাম ঋজুদার চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে, ঋজুদা ডান হাতটা ট্রাফিক কনস্টেবলের মত তুলে আমার বুকে ছোঁয়াল, আর ইশারায় আমাকে চুপ করে থাকতে বলল।

আমি এমনিতেই চুপ করে গেছিলাম, আমাকে ঋজুদার বলার দরকার ছিল না কোনও।

হাতীর চোখ বলে কিছু আছে বলে মনে হলো না। তখন চোখে চোখে তাকাবার মত অবস্থাও ছিল না আমার। সামনের সমস্তটুকু পথ বন্ধ করে হাতীটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কান নাড়তে লাগল। শুঁড়টা একবার তুলে জীপের বনেটের উপর দিয়ে, ছোটবেলায় ঠাকুমা যেমন ছোট বাচ্চাদের "হাত ঘোরালে নাড়ু পাবে" বলে হাত ঘোরাতেন, তেমন করে ঘুরিয়ে নিল।

ঋজুদারও বোধহয় কিছুই করার ছিল না। আমরা দুজনে যেন

বিরাট এক দৈত্যের সামনে লিলিপুটিয়ান মানুষের মত কতক্ষণ যে নিশ্চল হয়ে বসে থাকলাম মনে নেই।

বহুক্ষণ পর ডালপালা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে, আপন মনে, যেন কিছুই সে করেনি, এমন ভাব করে হাতীটা রাস্তা ছেড়ে বাঁ দিকের জঙ্গলে ঢুকে গেল।

ঋজুদা জীপটা আবার স্টার্ট করে আস্তে আস্তে ক্যাম্পের দিকে যেতে লাগল।

ঋজুদা বলল, বুঝলি রুদ্র, এই হাতীটাকে যেমন ভালোমানুষ



শুঁড়টা একবার তুলে জীপের বনেটের উপর দিয়ে ছোটবেলায় ঠাকুমা যেমন ছোট বাচ্চাদের হাত ঘোরালে নাড়ু পাবে বলে হাত ঘোরাতেন, তেমনি করে ঘুরিয়ে নিল।

দেখলি, ও কিন্তু তেমন নয়। এ পর্যন্ত ও তিনবার জঙ্গলে ট্রাক উল্টে দিয়েছে, তিন-চারজন লোক মেরেছে এবং ঘর ভেঙেছে অনেকগুলো। প্রত্যেক পূর্ণিমার দিনে হাতীটার পাগলামি বাড়ে।

আমি বললাম, তুমি এত আস্তে চালাচ্ছ কেন ঋজুদা, তাড়াতাড়ি চালাও না, যদি ও আবার আমাদের তাড়া করে আসে ?

ঋজুদা হাসল : বলল, ভয় নেই, এখন ও আর কিছু করবে না।

আশ্চর্য লাগে ভাবলে, ঋজুদা কি করে সব বোঝে, সবকিছু জানে ? কখন কোথায় গেলে চিতল হরিণকে কি খেতে দেখা যাবে, অশ্বত্থ গাছ ছেড়ে উড়ে যাওয়া হরিয়ালের ঝাঁক আবার ফিরে আসবে কিনা, এবং এলে কখন আসবে ? ভালিয়া-ভুলুর পাহাড়ের উঁচু রাস্তায় আমরা বিকেলে হাঁটতে যাওয়ার সময় সেই বুড়ো ভাল্লুকমশাইর সঙ্গে আমাদের দেখা হবে কি হবে না, এ-সবই ঋজুদা ঠিক ঠিক বলে দিতে পারে।

কি করে বলতে পারে জিজ্ঞেস করলেই ঋজুদা হাসে ; বলে, ওদের সকলের কুষ্টি আমার কাছে আছে।

৫ ॥

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল।

কি যেন একটি জানোয়ার ডাকতে ডাকতে পাহাড় থেকে নামছে। ডাকটা এমন অদ্ভুত আর ভয়াবহ যে, গা ছমছম করে এই ক্যাম্পের মধ্যে, কম্বলের তলায় শুয়েও।

প্রথমে সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি সাতজনেই ভুক্-ভুক্, কুঁই-কুঁই, কুঁক্-কুঁক্ করে ডেকে উঠে সেই জানোয়ারকে, অন্যায়ভাবে আমাদের ঘুম ভাঙ্গাবার জন্যে বকে দিল। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝলাম, তারা বারান্দার আগুনের কাছে, ঋজুদার খাটের একেবারে পাশে গুড়িসুড়ি মেরে বসল চুপটি করে।

আবার জানোয়ারটা ডাকল—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ করে।

ডাকটা এমন যে, শুনলে বুকের মধ্যেটা যেন কেমন করে। বিশেষ করে এই গভীর জঙ্গলের মধ্যে—শীতের শিশিরে-ভেজা মাঝ-রাতে!

আবার ডাকতেই বুঝলাম, এটা একটা হায়না।

শুয়ে শুয়েই আমি বুঝতে পারছিলাম, ভিজে ধুলো মাড়িয়ে, পাথরনুড়ি, ঘাস-পাতা, ফুল-লতা সবকিছু এড়িয়ে এড়িয়ে হায়নাটা পাহাড় থেকে নেমে আসছিল। শিশিরে তার অফ-হোয়াইট-রঙা লোমে ভরা গা'টা ভিজে গেছে। গায়ের কালো কালো রেখাগুলো নিশ্চয়ই আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পাহাড় বেয়ে নামছে আর মাঝে মাঝে পেছনের ছোট দুটো পায়ে ভর দিয়ে সামনের দুই পায়ে দাঁড়িয়ে মুখ ঘুরিয়ে এদিকে-ওদিকে দেখছে।

ঝিঁঝি ডাকছে অন্ধকারে, একটা কুম্ভাটুয়া পাখি ডাকছে একটানা ঢাব-ঢাব-ঢাব-ঢাব করে। সে ডাক অন্ধকার শীতার্ত

ভিজে জঙ্গলে-পাহাড়ে, ফিনফিনে বাঁশ পাতায়, গিলিরী ফুলে, ঝর্ণার পাশে গজিয়ে-ওঠা নতুন-চিকন-সবুজ ঘাসে ঘাসে ছড়িয়ে যাচ্ছে। ধ্রুবতারাটা চুপ করে দাঁড়িয়ে তার নীল চোখে রাতের এই একটুকরো জঙ্গলে কোথায় কি হচ্ছে দেখছে।

হায়নাটা আবার ডেকে উঠছে হাঃ-হাঃ-হাঃ হাঃ করে।

হায়নাটা যেন সকলকে বিদ্রূপ করছে—ও যেন ঘুমিয়ে-থাকা সব প্রাণীর ঘুমন্ত বুকে ওর এই ঠাট্টার তীক্ষ্ণ অস্বস্তি উলের কাঁটার মত ফুটিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

হায়নাটা পাহাড় থেকে নেমে আমাদের ক্যাম্পের পাশের পথ বেয়ে গ্রামের দিকে চলে গেল।

অনেকক্ষণ আর ঘুম এল না। কুম্ভাটুয়া পাখিটা ডেকেই যেতে লাগল। ও কি রাতে ঘুমোয় না? ও খালি ডাকে ঢাব-ঢাব-ঢাব করে। বাঁশঝাড়ে, সাহাজ ও কুরুমের জঙ্গলে, ঠাণ্ডায় কুঁকড়ে-যাওয়া পাহাড়ে পাহাড়ে ওর ডাক ধাক্কা খেয়ে খেয়ে ফিরে আসে।

কি জানি, এমনি রাতেই বাঘ্‌ড়ুম্বা ডাকে কিনা। যে-সব মানুষ নরখাদক বাঘের হাতে মারা যায় তারা এসব পাহাড়ে জঙ্গলে বাঘ্‌ডুম্বা ভূত হয়ে যায়। তারা হঠাৎ হঠাৎ কিরি-কিরি-কিরি-কিরি—ধূপ্-ধূপ্-ধূপ্-ধূপ্ করে আচমকা ডেকে ওঠে। ডাকতে ডাকতে অন্ধকার জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। জানি না, হয়ত এরকম রাতেই বুনো-মোষদের দেবতা টাঁড়বাড়ো মোষের দলের সঙ্গে পাহাড়ের উপরের কোনো শিশির-ভেজা ঘাসে ভরা মাঠে দাঁড়িয়ে কথা বলে।

এই বন, এই পাহাড়, রাতের বেলার এই গা-ছমছম করা পরিবেশ, এই পরিবেশেই বুঝি যারা দিনের আলোয় ঘুমিয়ে থাকে, সোনালি রোদে দেখাই যায় না, তারা সব ঘুম ভেঙে উঠে চলাফেরা করে, ফিসফিস করে।

শুয়ে শুয়ে আমি টিকরপাড়ার কথা ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, আমাদের দেশটা সত্যিই কত সুন্দর, কত বিচিত্র!

এখন টিকরপাড়ার ঘাটে গিয়ে দাঁড়ালে কেমন লাগবে ভাবছিলাম।

নিস্তব্ধ রাত্রি। শুধু কুলকুল করে গভীর অতল গণ্ড দিয়ে জল বয়ে চলেছে—কোনো মাছের নৌকোর রাত-জাগা মাঝি বুঝি একা ছইয়ের নীচে বসে হুঁকো খাচ্ছে। বাঁশের ভেলা ভেসে যাচ্ছে ঘুমন্ত মাঝিদের নিয়ে চৌদুয়ারের দিকে। নদীর ওপারের বৌধ রাজ্যের মাথা-উঁচু পাহাড়ের সায়ান্ধকারে একলা শিঙাল শম্বর নদীর দিকে চেয়ে কত কি ভাবছে।

ভাবছিলাম, এখন বড়মূল আর বড়সিলিঙার জঙ্গল কেমন দেখাচ্ছে। তারাভরা আকাশের নীচে বিস্তীর্ণ ছুধ্‌লি-ফুল-ভরা মাঠ পেরিয়ে গুহায় ফিরছে বড় বাঘ। চিতল হরিণের দল আমলকি তলায় জলের তলার মাছের ঝাঁকের মত চমকে উঠছে বাঘকে দেখে, তারপর পিছল অন্ধকার পেরিয়ে অন্য কোনো মাঠের দিকে চলে যাচ্ছে।

কোথাও কোনো শব্দ হচ্ছে না, শুধু টুপটাপ করে শিশির পড়ছে, শুধু ধ্রুবতারা তাকিয়ে আছে নীল চোখে, শুধু ঝিঁঝিদের ঝিম-ধরা কান্নায় ভরে আছে মাঠ, বন, পাহাড় ; ভরে আছে শুকিয়ে-যাওয়া ঝর্ণার হলুদ কোল ; ভরে আছে পাহাড়তলির স্যাঁৎসেঁতে, শ্যাওলা-ধরা খোল।···

বোধহয় মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে গেছিল, আর সেজন্যেই সকালে অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম। কখন যে পূবের রোদ বড় পিয়াশাল গাছটার ডাল থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আমার কম্বলে, আমার মুখে, কিছু টের পাইনি।

চোখ মেলে দেখি, অমৃত্‌দাদা আমার চৌপায়ার পাশে দাঁড়িয়ে। বলছে, কেয়া ইয়ার ? আজ দিন ভর্ শোনা কেয়া ?

আমি ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম।

বাইরে বেরিয়ে দেখি, রোদে ভরে গেছে চারপাশ। একদল টিয়া পাশের গাছগাছালিতে ট্যাঁ ট্যাঁ করছে—ক্যাম্প-ফায়ারের

পোড়া কাঠের গন্ধ বেরুচ্ছে, সামনের টুন্ গাছের ডালে একজোড়া খয়েরী-কালোয় মেশা বড় কাঠবিড়ালি পাতায় পাতায় ঝরঝরানি জাগিয়ে উঁচু ডালময় দৌড়াদৌড়ি করে বেড়াচ্ছে। শীতের সকালের খুশীভরা উষ্ণ রোদ এসে পড়েছে ওদের ভেলভেটের মত নরম গায়ে।

মুখ-টুখ ধুয়ে ক্যাম্পচেয়ারে বসলাম, চা খেলাম।

এমন সময় দেখি ঋজুদা গ্রামের দিক থেকে ফিরল। ঋজুদা অলিভগ্রীন-রঙা শিকারের পোশাক পরেছে। ইতিমধ্যেই চান-টান করে তৈরী।

ঋজুদার আমি সত্যি সত্যিই একজন দারুণ ভক্ত। বোধহয় আমার দাদা, বাবা, মামা, জামাইবাবু কাউকেও আমার এত ভাল লাগে না। ঋজুদার হাঁটা, বসা, ঋজুদার কথা বলা, ঋজুদার এক্লাফে জীপে ওঠার ভঙ্গী, ঋজুদার সকলের প্রতি ভালো ব্যবহার, ছোট-বড় সকলের প্রতি ভালোবাসা, এসব মিলে আমার চোখে ঋজুদা আমার আইডল্ হয়ে উঠছে। ঋজুদা আমাকে যা-ই করতে বলুক না কেন, আমি বিনা-প্রতিবাদে তাই করতে রাজী আছি।

ঋজুদা এসে আমার সামনে বসল। বলল, ঘুম ভাঙল রুদ্রবাবুর ?

—হুঁ। তুমি কোথায় গেছিলে ?

গেছিলাম গ্রামের প্রধানের কাছে—একটা কাজে। তোমাকে আর আমাকে এক্ষুনি একবার বেরুতে হবে। আজকে রাতে ফেরা নাও হতে পারে।

—কোথায় যাব ? আমি আনন্দে নেচে উঠলাম।

ঋজুদা পাইপটা ভরতে ভরতে বলল, চলোই না। আজ ক্যাল্‌কেসিয়ান বাবু মজা বুঝবে। জীপে যাওয়ার রাস্তা নেই—পায়ে হেঁটেই যেতে হবে। সারাদিনে পনেরো মাইল পথ হাঁটতে পারবি না ?

—প—নে—রো মাইল ? আমি আতঙ্কিত গলায় বললাম।

—ঋজুদা হাসল ; বলল, তা তো হবেই। পনেরো না হলেও

বারো-তেরো মাইল তো বটেই।

আমি একটু মীইয়ে গেলাম। বললাম, কোথায় যাবে, যাবে কেন?

ঋজুদাকে একটু অন্যমনস্ক দেখাল। ঋজুদা বলল, একটা আশ্চর্য কথা শুনলাম। যম-গড়া পাহাড়ের একটা বড় গুহার কাছে নাকি অবিশ্বাস্য সব ব্যাপার দেখতে পাওয়া যায়।

আমি বললাম, কি? ভূত?

ঋজুদা হাসল; বলল, তুই কি ভূতে বিশ্বাস করিস নাকি?

আমি বললাম, কখনো তো দেখিনি, না দেখে বিশ্বাস করব কি করে?

ঋজুদা হাসল; বলল, চল আজই তোকে দেখিয়ে দেবো। ডিম্বুলি গ্রামের ওরা অনেকেই নাকি দেখেছে। তাই চল, আমরাও দেখে আসি ব্যাপারটা কি? এমন একটা ইণ্টারেষ্টিং ব্যাপার, শোনার পরও না দেখার কোনো মানে হয় না।

আমি বললাম, কি ব্যাপার বলো না?

ঋজুদা আবার হাসল; বলল, না, তা এখন বলা চলবে না। তোমাকে দেখাতেই যখন নিয়ে যাচ্ছি, তখন মুখে আর বলব কেন? তারপর ঋজুদা বলল, তাড়াতাড়ি চান সেরে ব্রেকফাস্ট খেয়ে নাও, আমাদের ন'টার মধ্যে বেরোতে হবে।

আমি বললাম, বেশ।

তারপর ঋজুদা হঠাৎ বলল, রুদ্র, তোর ভয় করবে না তো?

ভয় আমার ইতিমধ্যেই করতে শুরু করেছিল, কিন্তু ঋজুদার সঙ্গে গেলে ভয় কি? তাছাড়া ভয়ের কথা কি মুখ ফুটে বলা যায়?

আমি হাসলাম, মুখে খুব সাহসের ভাব এনে বললাম, না না, ভয় কিসের?

—না করলেই ভাল। ঋজুদা বলল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা তৈরী হয়ে নিলাম। ব্রেকফাস্ট সেরে, জামাকাপড় পরে নিলাম। তারপর আমার ও ঋজুদার দুটো

হ্যাভারস্যাকে কিছু খাবারদাবার, চায়ের সরঞ্জাম, পেয়ালা এবং একটা করে বেশী জামা পুরে দিল মহান্তী। আরো অনেক টুকটাক জিনিষ। ঋজুদা দূরবীনটা নিল আর কোমরে বেল্টের সঙ্গে বেঁধে নিল ছোট্ট কালো চকচকে পয়েন্ট-টুটু পিস্তলটা।

আমি বললাম, কি ঋজুদা? বন্দুক রাইফেল কিছু নেবে না?

—না রে। শিকারে যাচ্ছি না তো আমরা, ভূত দেখতে যাচ্ছি। তোর বন্দুকও রেখে যা। বন্দুক রাইফেল ছাড়া খালি হাতে জঙ্গলে ঘোরার আনন্দ আলাদা—তাতে ভয় থাকে নিশ্চয়ই—কিন্তু ভয় থাকে বলেই তার আনন্দটাও অন্যরকম। তবে ভয়ের আর কি? সত্যিই যদি খালি হাতে গেলেই লোকে বিপদে পড়ত, তাহলে এই ডিম্বুলি গ্রামের ওরা সারাজীবন বনে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায় কি করে?

আমি বললাম, বাঃ রে। ওদের বিষ-মাখানো তীর আর ধনুক থাকে না? টাঙ্গী থাকে না?—ওরা কি একেবারে খালি হাতে যায়?

ঋজুদা বলল, মেয়েরা? তারা তো হাতে কিছু না নিয়েই জঙ্গলে চলাফেরা করে। যাই হোক, তোকে একটা টাঙ্গী নেওয়ার পারমিশান্ দেওয়া গেল। বলেই অমৃত্‌দাদাকে ডেকে একটা ভাল ধারওয়ালা চকচকে টাঙ্গী এনে আমাকে দিতে বলল।

একটু পরই ডিম্বুলি গ্রাম থেকে দুজন লোক এসে হাজির, তাদের কাঁধেও টাঙ্গী। পিঠে গামছা-বাঁধা পুঁটলি, বোধহয় খাবার আছে কিছু। ওদের গা খালি, খালি-পা, একটা মোটা ধুতি পরেছে সামনে কোঁচা ঝুলিয়ে—এদিকে ধুতি উঠে রয়েছে প্রায় হাঁটু অবধি। ওরা দু' ভাই। একজনের নাম শিবব, অন্যজনের নাম ভীম।

ঋজুদা মহান্তীকে ডেকে কিছু চাল, ডাল, তরকারী ওদের পুঁটুলিতে দিয়ে দিতে বলল। মহান্তী চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ এসব দিয়ে দিল।

আমি বললাম, কি ব্যাপার? আমরা কি পিকনিকে যাচ্ছি?

ঋজুদা বলল, পিকনিকই তো।

তারপর আমরা, যে পাকদণ্ডী পথটা ক্যাম্পের পাশ দিয়ে পাহাড়ে উঠে গেছে—যে-পথে কাল রাতে হায়না নেমেছিল পাহাড় থেকে—সে-পথ বেয়ে উঠতে লাগলাম।

যাওয়ার আগে, ঋজুদা মহান্তীকে বলেছিল, খিচুড়ির বন্দোবস্ত রেডি করে রাখতে—আগামী কাল আমরা দুপুর বারোটা থেকে রাত বারোটার মধ্যে যে-কোনো সময় ফিরতে পারি, এবং ফেরার আধঘন্টার মধ্যে গরম গরম খিচুড়ি, আলুভাজা এবং ডিমসেদ্ধ এবং শুকনো লংকা ভাজা চাই-ই।

পাহাড়ে যখন উঠতে লাগলাম, তখন দু'পাশে দেখার বিশেষ কিছু ছিল না। কারণ দু'পাশে জঙ্গল বেশ ঘন ছিল এবং জায়গাটা দিনের বেলাতেও সায়ান্ধকার ছিল। বড় বড় উচু গাছের পাতার আড়াল থেকে রোদের টুকরো-টাকরা এসে নীচে পড়েছে। নানারকম লতা, ফুল, নানারকম প্রজাপতি, পাখি। উঁচু ডালে বসে বড় ধনেশ পাখিগুলো (গ্রেটার ইণ্ডিয়ান হর্ন্‌বিলস্‌) ওদের বড় বড় ঠোঁট ফাঁক করে হ্যাঁক্ হ্যাঁক্ করে ডাকাডাকি আর ঝগড়া করছে।

পাখিগুলো যেখানেই থাকে, বড় গোল বাধায়, চেঁচামেচি করে জঙ্গল সরগরম করে তোলে। এগুলোকে বেশীর ভাগ দেখা যায় কুচিলা (নাক্স-ভমিকা) গাছে বসে থাকতে। কুচিলা গাছগুলো বেশ বড় হয়, পাতার মধ্যেটার রঙ একটু সাদাটে সাদাটে দেখায়। ধনেশ পাখি যখন একেবারে মগডালে বসে থাকে এবং যখন আওয়াজ করে না, তখন বোঝাই যায় না যে ওখানে পাখি আছে—ওদের সাদা বুকটাকে মনে হয়, আর একটা কুচিলা গাছের পাতা বুঝি।

আমি আর এতসব জানব কোথা থেকে? ঋজুদাই বলছিল তাই শুনছিলাম। ঋজুদা বলছিল, আরেকরকমের ধনেশ পাখি আছে, ছোট: তাদের বলে (লেসার ইণ্ডিয়ান হর্ন্‌বিলস্‌); তারাও চেঁচামেচি করতে ভালবাসে, তবে এত না। এখানে ভালিয়া বলে একরকমের গাছ আছে, ওদের সে গাছে বসে ফল খেতে দেখা যায়।

এখানের লোকরা তাই বড় ধনেশকে বলে কুচিলা-খাঁই, ছোট ধনেশকে বলে ভালিয়া-খাঁই।

এই ভালিয়া-খাঁই পাখিগুলোকেই গতকাল দেখছিলাম সন্ধের আগে আগে।

আমি ডিম্বুলি গ্রামের পথে হাঁটছিলাম।

গোধূলির আলো এদিকের পাহাড়, ওদিকের বন এবং বন ও পাহাড়ের মধ্যের বিস্তৃত স্তব্ধ শান্ত ক্ষেতকে কেমন এক সোনা-রঙে ভরিয়ে দিয়েছিল। দূরের জঙ্গলের কিনারে মাঠ পেরিয়ে কতগুলো বুনো তাল গাছ ছিল, সেই তালগাছগুলোর পাশ দিয়ে বহুরঙা-মেঘে-রঙীন আকাশের পটভূমিতে একটি ছোট ভালিয়া-খাঁইর ঝাঁক তাদের ছিপছিপে শরীর নিয়ে ভেসে যাচ্ছিল—রঙীন আকাশের পটভূমিতে সেই ছবিটি আমার চোখে গাঁথা হয়ে গেছিল; বুঝি গাঁথা হয়ে থাকবে চিরদিন।

আমরা মাথা নীচু করে উঠছি—কারণ পথটা খাড়া। ঋজুদা বলে, পাহাড়ে পথ চলার নিয়ম হলো, "চড়াইমে বুড্ডা ঔর উৎরাইমে জওয়ান।" মানে, উঠবার সময় শরীরের ভারটা মাথা সামনে ঝুঁকিয়ে দিয়ে সামনে করতে হয়, আর নামবার সময় মেরুদণ্ড সোজা করে মাথা পেছনে করে নামতে হয়।

আমরা উঠছি, এমন সময় কি একটা জানোয়ার খড়খড় করে বাঁদিকের জঙ্গল বেয়ে ওপাশের খাদে নেমে গেল।

শিব্ব অমনি ওদিকে চেয়ে বলল, "বাব্বু গুট্রে বড্ড শম্বর চালি গল্বা।"

ঋজুদা বলল, তা যাক। যে যাচ্ছে, তাকে যেতে দাও। তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, দেখতে পেলি?

আমি বললাম, না। দেখার আগেই তো চলে গেল।

আরো কিছুদূর ওঠার পর যখন প্রায় রীতিমত হাঁফ ধরে গেছে, তখন আমরা পাহাড়ের উপরে এসে পৌঁছলাম। সে জায়গাটা যে কি সুন্দর তা বলার মত ভাষা আমার নেই। আমি যদি

কোনো কবি বা সাহিত্যিক হতাম, তবে হয়ত বলতে পারতাম।

সেই মালভূমি একটি গড়ানো তৃণভূমি—সকালের রোদ সবেমাত্র এই শিশির-ভেজা তৃণভূমিকে শুকিয়ে খটখটে করে তুলেছে। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে একটি-ছ'টি বড় গাছ। এদিকে ওদিকে ছোট-বড় সৌখীন বাগানের টিলার মত কালো পাথরের টিলা। একপাশে একটা কবরখানা। এলোমেলোভাবে অনেকগুলো এবড়ো-খেবড়ো কিন্তু চোখা পাথর মাটিতে পোঁতা আছে।

কতরকম যে ঝোপ-ঝাড় চারিদিকে। মুতুরী, গিলিরী, শিয়ারী লতা আর না-নউরিয়া ফুলেব ঝোপ। প্রতিটি ঝোপে ও লতাতেই প্রায় ফুল ধরে আছে। একজায়গায় পাঁচ-ছ'টি আমলকী গাছ—ঝুরু ঝুরু পাতা ঝরা তাদের শেষ হয়ে গেছে তখন। যতদুর চোখ যায়—সবজে-পাটকিলে-রঙা মালভূমিটি দূরের নীল দিগন্তরেখায় মিশে গেছে।

কথা না বলে আমি অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ঋজুদা আমার কাঁধে হাত ছোঁওয়াল; হেসে বলল, কি রে? ভাল লাগছে?

আমি বললাম, দা-রু-ণ।

ঋজুদা বলল, কষ্ট করে যে পাহাড় চড়লি এতটা, তাই তো এমন সুন্দর জায়গায় আসতে পেলি। কষ্ট না করলে, পাহাড় না চড়লে, কোনো সুন্দর কিছুই পাওয়া বা দেখা যায় না, বুঝলে রুদ্রবাবু!

বললাম, হুঁ। ভাবছিলাম এই জন্যেই ঠাকুমা বলেন, কষ্ট করলে কেষ্ট মেলে। দেখছি, কথাটা তো সত্যিই।

ঋজুদা বলল, তুই তো একেবারে হাঁপিয়ে গেছিস রে; ঠিক আছে, বসে নে এই গাছতলায় দশমিনিট, তারপর আবার যাওয়া যাবে।

আমি আর দেরী না করে একটা পাথরে বসে পড়লাম, তারপর ঋজুদার কথানুযায়ী ফ্লাস্ক থেকে একটু কফি নিজে নিলাম এবং

ঋজুদাকে দিলাম।

ঋজুদা কফির প্লাস্টিকের গ্লাসটা পাশে রেখে পাইপ ভরতে ভরতে শিব্ব আর ভীমকে পকেট থেকে বিড়ির বাণ্ডিল বের করে দিল।

আমি কফিটা শেষ করে গ্লাসটা ওয়াটার-বট্‌লের জলে ধুয়ে হ্যাভারস্যাকে রাখতে যাব, এমন সময় ঋজুদা আমার কাঁধে হাত ছোঁওয়াল। চমকে উঠে দেখি, দূরের আমলকি গাছগুলোর তলায় একদল চিতল হরিণ আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে চড়ছে।

দলটা বেশ বড়। কিছু হরিণ শুয়ে-বসে আছে, জাবর কাটছে। আর অন্যগুলো দাঁড়িয়ে।

যেগুলোর মাথায় বড় বড় শিং তারা এদিকে ওদিকে প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে। একটা হরিণের রঙ কেমন কালচে কালচে হয়ে গেছে।

ওর রঙ কালচে হয়ে গেছে কেন শুধোতেই ঋজুদা বলল, ও খুব বুড়ো হয়ে গেছে—তাই হলুদ রঙে কালচে ছোপ লেগেছে। এই মালভূমি ভগবানের। এখানে কেউ শিকার করে না। এখানে শুধু শান্তি। ছাখ-না, এটা আগে আদিবাসীদের গোরস্থান ছিল।

আমি বললাম, ওরা কি কেউ মরে গেলে কবর দেয় নাকি? পোড়ায় না?

ঋজুদা বলল, সাধারণতঃ পোড়ায়, কিন্তু যদি কেউ দুর্ঘটনায় মারা যায়, অথবা যদি কোনো শিশু মারা যায়, অথবা যাদের সন্তান হবে এমন কোনো মেয়েমানুষ যদি মারা যায়, তাহলে তারা তাদের এখানে এনে কবর দেয়। জানিস তো, এই সব অঞ্চলে খন্দ্ বলে একটা উপজাতি ছিল, ওরা মানুষ বলি দিত। জীবন্ত অবস্থায়ই কোনো মানুষের গা থেকে খুবলে খুবলে মাংস কেটে নিত। লোকটা যখন দৌড়ত, তার পেছন পেছন দৌড়ে ওরা ওরকমভাবে মাংস খুবলে খুবলে তাকে অর্ধমৃত করে ফেলার

পর তার মাথার খুলিতে আঘাত করে মেরে ফেলত। সেই সব লোককে ওরা বলত "মেরিয়া"।

—এদিকে খন্দ্‌রা আছে? আমি ভয়ে ভয়ে শুধোলাম।

—আছে। তবে এদিকে বেশী নেই, খন্দ্‌দের বাস খন্দ্‌মালে —মহানদীর ওপারে—দশপাল্লা, আর বৌধে বেশী আছে। তবে এখন কি আর ও সব প্রথা আছে? আগে ছিল।

আমি শুধোলাম, ঋজুদা, তুমি কখনো বাঘ্‌ডুম্বা দেখেছ?

ঋজুদা একগাল ধোঁয়া ছেড়ে হাসল একবার, তারপর বলল, চলো-না, তোমাকে আজ রাতেই দেখাব।

আমাদের এই ফিসফিসানিও বোধ হয় হরিণগুলোর কানে গিয়ে থাকবে। ওরা আস্তে আস্তে আবার ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালের সবুজ অন্ধকারে ফিরে গেল হলুদ আলোর রাজ্য থেকে।

ঋজুদা লাফিয়ে উঠল। বলল, চল। আর দেরী নয়।

আমরা মালভূমিটা যেখানে সবচেয়ে কম চওড়া—(এই দেড়শ' মিটার মত হবে) সেখান দিয়ে মালভূমিটাকে পেরিয়ে পাহাড় থেকে নামতে লাগলাম।

এখন পথ বলতে কিছুই নেই। এখন যে পথে আমরা নামছি, তাতে কোনো মানুষের পা ছ'মাসে ন'মাসে পড়ে কি না সন্দেহ। এটা একটা জানোয়ার চলার পথ, ইংরিজীতে যাকে "গেম-ট্র্যাক" বলে।

পায়ের খুরে খুরে মাটি উঠে গেছে, ঘাস সরে গেছে। যেখানে যেখানে সেই পথ ধুলো বা নরম মাটির উপর দিয়ে গেছে সেখানে কত যে জানোয়ারের পায়ের দাগ তা কী বলব!

ভীম আমাদের আগে আগে যেতে যেতে ধারাবিবরণী দিতে দিতে চলেছে।—এইটা চিতল হরিণের দাগ, এই যে কালো কালো ছাগল-নাদির মত নাদি পড়ে আছে এগুলো কুটরা হরিণের। এইখান দিয়ে শুয়োরের দল পথ ছেড়ে পাশের জঙ্গলে ঢুকে গেছে। এটা নীলগাই। এগুলো একজোড়া চিতার পায়ের দাগ। এটা

শম্বরের। ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভাবলেও আশ্চর্য লাগে, এই যে এত জানোয়ার এপথে যাওয়া-আসা করে, তারা এখন কোথায়?—তাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হচ্ছে না কেন? শেষকালে কথাটি জিজ্ঞেস করেই ফেললাম ঋজুদাকে।

ঋজুদা বলল, এ কি আর কোলকাতার রাস্তা পেয়েছিস! এরা বেশীর ভাগ সময়েই চলাফেরা করে রাতের অন্ধকারে, তবে দিনেও যে করে না এমন নয়—এখনও অনেকে হয়ত এ পথেই আসছিল, কিন্তু আমরা যেরকম গল্প করতে করতে হাঁটছি তা তো ওরা আধমাইল দূর থেকেই শুনতে পাবে, হাওয়ায় আমাদের গন্ধ পাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের জঙ্গলে ঢুকে যাবে; আড়াল নেবে। ওদের মধ্যে অনেকে হয়ত আড়াল থেকে আমাদের লক্ষ্যও করবে। জঙ্গলের পরিবেশে জংলী জানোয়ার তোর থেকে মাত্র পাঁচ হাত দূরে এমন করে লুকিয়ে থাকবে যে, তুই টেরও পাবি না।

কিছুদূর যাওয়ার পর পথটা পাহাড়ের একটা খাঁজ ধরে প্রায় সমান্তরাল রেখায় চলেছে। বাঁদিকে জঙ্গলময় পাহাড় উঠে গেছে—আর ডানদিকে খাড়া খাদ। খাদের অনেক নীচে একটা নদী বয়ে চলেছে। নদীর নাম—সহেলী। উপর থেকে সহেলী নদীর শীর্ণ বুক দেখা যাচ্ছে—পাথর আর বালির মধ্যে মধ্যে তিরতির করে জল বয়ে চলেছে।

একটা মোড় ঘুরেই চোখে পড়ল, নদীর ধারে অনেকগুলো পাতার কুঁড়ে। অত উপর থেকে দেখার জন্য কুঁড়েগুলোকে ক্ষুদে ক্ষুদে দেখাচ্ছিল। রান্না হচ্ছে তার মধ্যে কতগুলোতে—ধোঁয়ার কুণ্ডলী খাদ বেয়ে উঠে উপরের দিকে আসছে। অনেকগুলো রঙীন শাড়ি মেলা রয়েছে নদীর বালিতে; পাথরে।

ঋজুদা শিব্বর দিকে চেয়ে বলল, অঙ্গুলের ব্রজ দাস এখানে ক্যাম্প করেছে বুঝি?

শিব্ব বলল, হ্যাঁ। সাঁওতাল রেজা কুলি এনেছে পথ বানাবার জন্যে।

আমি বললাম, রেজা কুলি কাকে বলে? আর পথ বানাবে কেন ঋজুদা?

ঋজুদা বলল, রেজা কুলি মানে মেয়ে কুলি। আর যারা বড় ঠিকাদার, তাদের প্রত্যেককেই নিজেদের পথ নিজেদেরই বানিয়ে নিতে হয় জঙ্গলে—নইলে কাঠ কেটে সে কাঠ পাহাড় থেকে নামাবে কি করে লরী দিয়ে? যে জঙ্গল উনি ইজারা নিয়েছেন তা হয়ত পাহাড়ের মাথায়—সেখানে কাঠ কাটলেই তো হলো না, কাঠ তো নামিয়ে এনে শহরে পৌঁছাতে হবে। তাই প্রত্যেককেই নিজের নিজের পথ বানিয়ে নিতে হয়।

আমি বললাম, তুমি যে বানাওনি!

ঋজুদা হাসল; বলল, এ বছরে আমার সব জঙ্গল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের পথের আশেপাশেই। তাই আমাকে আর আলাদা করে পথ বানাতে হয়নি। নইলে অন্যান্য বছরে পথ বানাতে হয় বৈকি। পথ বানানোটাও খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। ব্লাস্টিং করে করে পাথর ফাটিয়ে একটু একটু করে কোদাল আর গাঁইতি চালিয়ে চালিয়ে পথ তৈরী করতে হয়। একবার ঐ সময়ে আসিস, এলে দেখতে পাবি।

ব্রজ দাসের ক্যাম্প আর দেখা যাচ্ছে না।

যখন আমরা হরিণ দেখেছিলাম তখন থেকে প্রায় দেড়ঘণ্টা আমরা হাঁটছি। এখন রোদটা বেশ কড়া হয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে বেশ ক্ষিদেও পেয়েছে। কিন্তু পথের যা দৃশ্য তাতে ক্ষিদে তেষ্টা সব ভুলে গেছি।

হঠাৎ দুটো নীল-রঙা রক-পিজিয়ান্ আমাদের সামনে পথের উপর উড়ে এসে বসল। ওরা পাহাড়ী নদীর বুকে এতক্ষণ বসেছিল। জানি না, কি করছিল। ভারী সুন্দর দেখতে পাখিগুলো—পায়রাই, তবে নীলচে-সবজে রঙ। এরা পাহাড়ে জঙ্গলে পাথুরে জায়গায়

থাকে—তাই এদের নাম রক-পিজিয়ান্।

পাখির কথা আর কি বলব? কত যে পাখি সকাল থেকে দেখলাম—কতরকম যে তাদের গায়ের রঙ, কতরকম যে তাদের গলার স্বর!

হলুদ-বসন্ত পাখির হলদে-কালো নরম শরীর—পাখিগুলো সুন্দর ডাকে। ঋজুদা এই পাখি ভীষণ ভালোবাসে। আমি একদিন একটা পাখি মারতে গেছিলাম, ঋজুদা এমন বকুনি লাগিয়েছিল আমায় যে, জীবনে তা ভুলব না। সত্যি এমন সুন্দর পাখি মারা উচিত নয়।

নীলকণ্ঠ পাখির ঘন নীল রঙ, টিয়ার সবুজ কচি কলাপাতা সবুজ, টুঁই-এর পাখনার গাঢ় সবুজ, বনমোরগের সোনালি কালো, ময়ূরের মেঘের মত নীল, রাজঘুঘুর মখমল বাদামি, মৌ-টুশকি পাখির মুঠিভরা মেটে রঙ।

টিয়া ডাকছে ট্যাঁ ট্যাঁ, টুই ডাকছে টিঁ-টুই টিঁ-টুই। টুঁই বসে বসে যত না ডাকে তার চেয়ে বেশী ডাকে হাওয়ায় দোল খেতে খেতে—হাওয়ার নাগরদোলায় চেপে শীষ দেয় ওরা। রাজঘুঘুর গম্ভীর ঘুঘুর-ঘু দুপুরের নির্জনতায় ঘুম পাড়িয়ে দেয় যেন। নানারঙা মৌ-টুশকিরা তাদের ছোট ছোট চিকন ঠোঁটে কি যে সব ফিসফিস করে বলে, বোঝা যায় না। কোনো কোনো অনামা অজানা পাখি ডাকে তো না, যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

কারো ডাক শুনলে মন আনন্দে নেচে ওঠে—কারো ডাক শুনলে মন খারাপ হয়ে যায়। আর এইসব ছোট বড় নানান পাখির ডাক ছাড়িয়ে উপত্যকার উপরে চক্কর-মারা ক্ষয়েরী চিল আর বাজেদের তীক্ষ্ণ চিকন বাঁশী বেজে ওঠে চিঁ চি করে আর কানে আসে পাহাড়ের অন্ধকারে কুচিলাগাছে বসে থাকা ধনেশ পাখিদের হেঁড়ে গলার ডাক—হ্যাঁক্ হ্যাঁক, হক্ক—হক্ক।

আমরা আরো এগিয়ে গেলাম। সেই সহেলী নদী কিন্তু বরাবরই আমাদের ডান পাশেই চলেছে। এক এক জায়গায়

নদীর এক এক চেহারা। কোথাও শুধু বালি, কোথাও শুধু পাথর, কোথাও শুধু ছায়ায়-জমা গভীর জল। তার চারপাশের পাথরে শ্যাওলা ধরে আছে, নানারকম অর্কিড গজিয়েছে গাছের গুঁড়ি থেকে, সে সব জায়গায় ঝর্ণা নেমেছে এ-পাশ ও-পাশ থেকে নদীতে।

আরো মিনিট পনেরো হাঁটার পর হঠাৎ আমার চোখ পড়ল নদীটার দিকে। গেরুয়া বালি, এক জায়গায় খুব বড় বড় চেটালো পাথর অনেকগুলো। সেই পাথরের উপরে লাল লাল তিনটে কি জানোয়ার শুয়ে আছে।

ঋজুদা আমার সামনে সামনে যাচ্ছিল, কিন্তু বাঁদিকের ঝোপের মধ্যে ফুটে-থাকা একরকমের হলুদ গোল-গোল ফলের দিকে মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে হাঁটছিল!

আমি দু' পা দৌড়ে গিয়ে পেছন থেকে ঋজুদার বেল্ট ধরে টানলাম।

ঋজুদা চমকে গিয়ে ও একটু বিরক্ত হয়ে থেমে পড়ে মুখ ফিরিয়ে বলল, কি রে রুদ্র?

আমি ঋজুদাকে নদীর দিকে দেখালাম।

ঋজুদা পথের একেবারে ডানদিকে চলে গিয়ে একটা গাছের নীচে বসে পড়ল। বলল, তোর বরাত তো খুব ভাল রে রুদ্র। জঙ্গলে একশ' বছর থাকলেও এমন দৃশ্য দেখা যায় না।

আমি ঋজুদার পাশে বসে বললাম, ওগুলো কি জানোয়ার ঋজুদা?

ঋজুদা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কি জানোয়ার তা-ই বুঝতে পারিসনি? বাঘ রে বাঘ। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। মা বাঘ তার দুই বাচ্চা বাঘকে নিয়ে রোদ পোয়াচ্ছে।

শিবব আর ভীমও আমাদের পাশে বসে পড়ল। মুখে দুজনেই সমস্বরে বলল, 'আলো বাপ্পালো।'

আমি ঋজুদাকে ভয়ে ভয়ে বললাম, এখানে যে খুব বসে

পড়লে, যদি তিনজনে একসঙ্গে উপরে উঠে আসে ?

ঋজুদা হাসল ; বলল, ওদের পায়ে বাত আছে ; আসবে না।

আমার তখন অবস্থা বিশেষ ভাল নয়, এদিকে ওদিকে বড় গাছ আছে কিনা দেখছি, যাতে বাঘে তাড়া করলে তাড়াতাড়ি উঠে পড়তে পারি।

সত্যি কথা বলতে কি, আমার ঋজুদার উপর রাগ হতে লাগল —এই রকম সব ভয়াবহ জঙ্গলে কেউ খালি হাতে আসে ? ঐ পুঁচকে পিস্তলটা থাকলেই বা কি, না থাকলেই বা কি ? ঋজুদাটার সবই বেশী বেশী : কি যে করে না !

আমি ফিসফিস করে বললাম, ঋজুদা, তুমি বললে যে ঐ দুটো বাচ্চা, কিন্তু তিনটেই তো সমান। তিনটেই যে বেশ বড়।

ঋজুদা কথা না বলে দূরবীনটা আমার হাতে দিল। বলল, ভাল করে দেখে নে, সারা জীবনে এমন দৃশ্য আর দেখার সুযোগ নাও আসতে পারে। বলে, নিজে পাইপ বের করে পাইপ পরিষ্কার করতে লাগল।

আমার মন বলল, এখন তো কোমর থেকে পিস্তলটা বের করে হাতে নিলেই পারে, একটু আগেই তো পাইপ খেল, এমনি করে বাঘের মাথার উপরে পা ঝুলিয়ে বসে পাইপ খাওয়ার কি যে দরকার জানি না।

দূরবীনটা চোখে লাগাতেই বাঘগুলো যেন লাফিয়ে কাছে চলে এল শুয়ে শুয়েই।

পরিষ্কার দেখতে পেলাম, বড় বাঘিনীটা চার পা শূন্যে তুলে কিরকম মজা করে রোদ পোয়াচ্ছে। তার তলপেটের সাদা লোম-গুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে নাকের কালো অংশ। অপেক্ষাকৃত ছোট বাঘ দুটো পাশ ফিরে শুয়ে আছে। একজন তো তার মাকে কোল-বালিশ করে সামনের এক পা তুলে দিয়েছে তার গায়ে।

আমরা কতক্ষণ বসে ছিলাম হুঁশ ছিল না।

শিব্ব বলল, বাবু, একটা ঢিল ছুঁড়ব ?

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, না, না।

ঋজুদা বলল, কেন? ওরা রোদ পোয়াচ্ছে তাতে তোমার কি অসুবিধাটা হলো ?

কিন্তু আমাদের কথাবার্তা বলার জন্যেই হোক কি ঋজুদার পাইপের মিষ্টি গন্ধেই হোক, একটা বাচ্চা বাঘ তড়াক করে ডিগবাজী খেয়ে উঠে বসে উপরের দিকে তাকাল। ও ওদের ভাষায় চাপা গলায় কিছু বলেছিল কি না তা আমি শুনতে পাইনি, কিন্তু তারপরেই দেখলাম মা-বাঘ এবং অন্য বাচ্চাটাও ঘুম ভেঙ্গে উঠে উপরে তাকাল।

মা-বাঘ একবার আমাদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে মুখ তুলে ডাকল, উঁ—আও।

সমস্ত বন পাহাড় গমগম করে উঠল সেই ডাকে।

কিন্তু তারা আমাদের দিকে উঠে না এসে, পরক্ষণেই নদী



কিন্তু তারপরেই দেখলাম মা-বাঘ এবং অন্য বাচ্চাটাও ঘুম ভেঙে উঠে ওপরে তাকাল

পেরিয়ে সুন্দর সহজ দৌড়ে ওপারের ঘন জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঋজুদা বলল, চল্ এবার যাওয়া যাক। তারপর বলল, বাচ্চা দুটো বেশ বড় হয়ে গেছে। দিন দশ-পনেরোর মধ্যেই ওরা মাকে ছেড়ে চলে যাবে।

আমি বললাম, কেন, চলে যাবে কেন?

কারণ, তাই-ই নিয়ম।

ওরা যখন ছোট থাকে—মা'র কাছে থাকে। শহরের মায়েরা যেমন বাচ্চা নিজে খেতে শিখলে, চান করতে শিখলে, কারো হাত না-ধরে বড় রাস্তা পেরোতে শিখলে নিশ্চিন্ত হন, বাঘেদের মায়েরাও তেমনি জঙ্গলের নিয়ম-কানুন, শিকার ধরার কায়দা ইত্যাদি সব শেখানো হয়ে গেলে বাচ্চাদের ছেড়ে দেয় স্বাধীনতা দিয়ে। প্রত্যেকটা বাঘ তাদের স্বাধীনতাকে ভীষণ ভালবাসে। এমনকি বাঘ ও বাঘিনীও একসঙ্গে থাকে না। ঘর-সংসার করার জন্যে বছরের কিছু সময় তারা একসঙ্গে থাকে—তারপরই যে যার স্বাধীন। খুব ভাল সিস্টেম, তাই না?

আমি বললাম, ঠিক বলেছ, মা আর বাবা আলাদা আলাদা-ভাবে থাকলে বেশী ঝগড়া-ঝাঁটি হতে পারত না, না?

ঋজুদা হাসল; বলল, দাঁড়া তোর বাবাকে আমি লিখে দিচ্ছি।

আমি বললাম, এ্যাই, ভাল হবে না বলছি।

ওখান থেকে ওঠবার আগে ঋজুদা শিব্বকে শুধোল, আমরা যেখানে যাব, সে জায়গাটা এখান থেকে কতদূর?

শিব্ব বলল, আরো ঘণ্টাখানেকের পথ।

আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এ পর্যন্ত প্রায় ছ-সাত ঘণ্টা হেঁটেছি।

ঋজুদা বলল, এমনি ভাবে হাঁটলে সমান রাস্তায় একজন মানুষ ঘণ্টায় চার মাইল হাঁটতে পারে। আর এই পাহাড়ী রাস্তায় ঘণ্টায় দু' আড়াই মাইল হাঁটা যায়, বিশেষ করে চড়াই-এর

রাস্তায় রুদ্রবাবুর মত ক্যাল্‌কেসিয়ান সঙ্গে থাকলে।

আমি বললাম, তাহলে আমরা কত মাইল এলাম?

তা প্রায় মাইল সাতেক হবে। একটু বেশীও হতে পারে, ঋজুদা বলল। তারপরই আবার বলল, চল্‌ ওঠা যাক। ওখানে পৌঁছে আবার দিনের আলো থাকতে থাকতে খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে। তোর তো ক্ষিদে পেয়ে গেছে নিশ্চয়ই।

আমার রাগ হলো। আমি বললাম, আহা! আমার একারই যেন পেয়েছে, তোমার বুঝি আর পায়নি!

ঋজুদা হাসল; বলল, চটছিস কেন? সকলেই খাব—পেট ভরে। রাতে কি না কি দেখতে হবে তা কে জানে? এই হয়তো শেষ খাওয়া। বলে আমার দিকে আড়চোখে তাকাল।

তারপর আমরা সকলে উঠে পড়লাম।

এবার আর একটু গিয়েই আমরা সেই নদীর পাশের পথ ছেড়ে বাঁদিকে ঢুকে গেলাম।

শিব্ব ঋজুদাকে বলল, ঐ নদীর পাশের পথটায় একটু গিয়েই একটা 'নুনী' আছে, পথটা ওখানে শেষ হয়ে গেছে।

আমি শুধোলাম, 'নুনী' কি ঋজুদা?

ঋজুদা বলল, 'নুনী' বলে এখানে, বাংলায় বলে নোনামাটি, ইংরিজীতে বলে সল্ট-লিক্। পাহাড়ে জঙ্গলে এক একটা জায়গা থাকে, যেখানে মাটিতে নুন থাকে। জানোয়ারেরা সেখানে আসে মাটি চেটে নুন খেতে। নুন খেলে আফিং-এর মতো ওদের নেশা হয়ে যায়। যে সব জানোয়ার ঘাসপাতা খেয়ে থাকে, তারাই সাধারণতঃ আসে এসব নুনীতে, আর তাদের পেছনে পেছনে তাদের ধরবার জন্যে আসে বাঘ।

আমি বললাম, একদিন জানোয়ার দেখবার জন্যে এখানে নিয়ে আসবে আমাকে?

ঋজুদা বলল, এতদূরে আসবি কেন? আমাদের ক্যাম্পের দু' মাইলের মধ্যেই একটা ভাল 'নুনী' আছে, নিয়ে যাব একদিন,

তবে এখন নয়। পূর্ণিমার রাতে। ওখানে তো আর টর্চ জ্বালিয়ে দেখতে পাবি না।

এখানে রাস্তাটা আবার চড়াইয়ে উঠেছে। তাই সকলেই একটু আস্তে আস্তে চলছে।

আমরা প্রায় আধঘণ্টাখানেক হলো বাঘের জায়গা থেকে চলে এসেছি। রোদের তেজ আর এখন তেমন নেই।

চড়াইটা ওঠা শেষ হলেই দেখলাম সামনে একটা ফাঁকা মাঠ। একেবারে ফাঁকা না—জংলী ঘাস, দুধলি ফুল, মাঝে মাঝে নাম-না-জানা ফুলের ঝোপ-ঝাড় আর সেই মাঠ পেরিয়ে ঐ দূরে দেখা যাচ্ছে একটা পাহাড়, তার পাশে একটা ভাঙ্গা গড় মতো। গড়ের গা বেয়ে বট-অশ্বত্থের চারা গজিয়েছে।

ভীম বলল, 'গড় আসি গলা।'

আমরা সকলে অবাক হয়ে ঐ দিকে তাকিয়ে এগোতে লাগলাম।

সূর্য ততক্ষণে পশ্চিমে বেশ হেলে পড়েছে।

গড়ের কাছাকাছি এসে আমরা পাহাড়টা ভাল করে দেখলাম। পাহাড়টা ছোট, কিন্তু পাহাড়ের গায়ে একটা বিরাট গুহামুখ।

আমরা যখন সেই গড়ের ফটক পেরিয়ে ভিতরে ঢুকলাম তখন প্রায় চারটে বাজে।

ফটকটাই আছে, চারপাশের দেওয়াল সব ধ্বসে গেছে।

ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকছি এমন সময় আমাদের পেছনে দূর থেকে ঘন ঘন বাঘের ডাক শোনা গেল। বোধহয় যে বাঘগুলোকে আমরা দেখলাম, সেই বাঘগুলোই ডাকছিল, নদীর ওপার থেকে। নির্জন জঙ্গলে পাহাড়ে বাঘ ডাকলে তার প্রতিধ্বনি দু-তিন মাইল দূর থেকে সহজে শোনা যায়।

আমি ঋজুদাকে বললাম, ঐ বাঘগুলো রাতে আমাদের এখানে চলে আসতে পারে কি, এতদূরে ?

ঋজুদা হাসল ; বলল, ইচ্ছা করলে বাঘ এক রাতে পঞ্চাশ

মাইলের চক্কর লাগায়, আর এ তো বাঘের ঘরের বারান্দা। আসতে পারে বই কী। কিন্তু রুদ্রবাবু কি ভয় পাচ্ছ? ভয় পেলে তোমাকে আর কখনও আমার সঙ্গে নিয়ে আসব না।

আমি লজ্জা পেলাম। বললাম, না, না, ভয় পাব কেন? এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম।

ঋজুদা শিব্ব আর ভীমের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কি সব কথাবার্তা বলল, তারপর গড়ের বারান্দায় একটা জায়গা পরিষ্কার করতে বলল ওদের।

ভাঙ্গা গড়, মধ্যে বাদুর চামচিকেতে ভর্তি। সাপ-কোপ থাকাও স্বাভাবিক। তাই ঋজুদা বলল, আমরা বাইরের বারান্দাতেই থাকব রাতে। তিন দিকে দেওয়াল পাব, আর যেদিক খোলা সেদিকেই গুহার মুখ। যদি কিছু দেখার থাকে, তো দেখা যাবে।

শিব্ব আর ভীম আশপাশের ঝোপ-ঝাড়ে গিয়ে টাঙ্গী দিয়ে ডালসুদ্ধ পাতা কেটে আনল, এবং সেই ডাল ধরে পাতাগুলোকে ঝাঁটার মতো ব্যবহার করে বারান্দাটা পরিষ্কার করতে লাগল।

ঋজুদা বলল, দূরবীন-টুরবীন সব এখানে থাক। আয় রুদ্র, আমরা খাওয়ার বন্দোবস্ত করি।

শিব্বর পুঁটলি থেকে একটা মাটির হাঁড়ি বেরোল; চাল, ডাল ইত্যাদিও বেরোল। মহান্তী যা যা দিয়ে দিয়েছিল সব। এ সব নিয়ে ঋজুদার সঙ্গে আমি গিয়ে গড়ের পাশের ঝর্ণাতলায় পৌছলাম।

কুলকুল করে জল বয়ে যাচ্ছে, পরিষ্কার জল, পাথরে পাথরে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে। এপাশে ওপাশে অসংখ্য পাথর—বড়, ছোট, গোল আর সমান; বিভিন্নাকৃতি।

ঋজুদার কথামতো, হাঁড়ি ধুয়ে, হাঁড়িতে জল ভরে, হাতে করে মুঠো মুঠো চাল-ডাল ধুয়ে আমি হাঁড়িতে পুরলাম, তারপর তার মধ্যে আলু পেঁয়াজ ইত্যাদি যা ছিল সব দিলাম।

শিব্ব এসে তিনটে গোল পাথর এক করে তার মধ্যে কিছু শুকনো কাঠ ও পাতা গুঁজে দিয়ে, ঋজুদার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে

দেশলাই ঠুকে দিল।

আগুন দেখতে দেখতে গনগনে হয়ে উঠল।

ঋজুদা বলল, তুই এখানে বসে রান্না কর রুদ্র। জঙ্গলে এলে সব করতে হয়, সব কিছু শিখতে হয়। এই বলে একটা শুকনো ডাল ভেঙ্গে আমায় দিয়ে বলল, এই তোর হাতা বা খুন্তী যাই-ই বলো তাই। মাঝে মাঝে এ দিয়ে হাঁড়ির ভিতরের খিচুড়ি নাড়বি, নইলে তলায় ধরে যাবে।

ঋজুদা চলে গেল।

ওখানে বসে দেখতে পেলাম, অনেক শুকনো কাঠ এনে জড় করছে শিব্ব আর ভীম। সারা রাত বোধহয় আগুন জ্বলবে, তাই।

ঝর্ণার কাছে আমি একা বসে আছি, হাঁড়ি সামনে করে। আগুন বেশ জোর হয়েছে। একটু পরই টগ্‌বগ্‌ করে জল ফুটবে—খিচুড়ি পাকবে।

ঝর্ণায় ঝর ঝর করে জল বয়ে চলেছে। নানারকম পাখির ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। বিকেলের রোদ পড়ে আসছে—সমস্ত মাঠটা, দূরের জঙ্গল, পেছনের পাহাড় ও গুহা সব কেমন এক সোনালি রহস্যের আঁচল মুড়ি দিয়ে ফেলেছে। একটু পরেই অন্ধকার হয়ে যাবে। সন্ধ্যাতারাটা উঠবে একা একা—তারপর দিগন্তরেখার উপরে স্থির হয়ে শান্তি ছড়াবে সমস্ত রাতের পৃথিবীতে।

হঠাৎ আমার মাথার কাছ থেকে ছিঁক্ ছিঁক্ করে একটা আওয়াজ শুনলাম।

মুখ তুলেই দেখি, আমার পেছনের কুরুম্ গাছটার মাঝের ডাল থেকে দুটো বড় বাদামী কাঠবেড়ালি কুতকুতে চোখ মেলে আমাকে দেখছে।

এই কাঠবিড়ালিগুলো দেখতে ভারী ভাল। এখানের লোকেরা বলে 'নেপালী মুসা'। মানে নেপালি ইঁদুর। কেন এমন বলে জানি না।

আমি মুখ তুলে ওদের দিকে ভাল করে তাকাতেই আবার একটা ছিঁক্ ছিঁক্ আওয়াজ হলো এবং তারপরই ওরা দুজনে পাতায় পাতায় ঝরঝর ঝরঝরানি আওয়াজ তুলে এ ডাল থেকে ও ডালে, ও ডাল থেকে সে ডালে এবং দেখতে দেখতে চোখের থেকে আড়ালে চলে গেল। ওরা চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ পাতায় পাতায় হিসহিসানি শোনা যেতে লাগল।

এবার খিচুড়ি আবার আওয়াজ দিতে লাগল—টগবগ, বগবগ করে। আমিও আমার ভাঙ্গা ডাল নিয়ে তাকে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। খিচুড়ি তো প্রায় হয়ে এল। কিন্তু আমার ভাবনা হলো, খাব কোথায় ? তাড়াতাড়িতে তো প্লাসটিকের ডিশ-টিশ কিছুই আনা হয়নি।

একটু পর ঋজুদা এল। বলল, কি রে ? ও কিসের আওয়াজ ? খিদেয় তোর পেট কাঁদছে, না খিচুড়ি কাঁদছে ?

আমি বললাম, হয়ে গেছে।

ঋজুদা একটু দেখে নিল। আমি কাগজে মোড়া নুনের থেকে বেশ একটু নুন মিশিয়ে দিয়ে সেই ডালটা দিয়ে নেড়ে দিলাম হাঁড়ি।

শিবব আর ভীমও এল।

ওরা নীরব কর্মী, বিনা বাক্যব্যয়ে আঁজলা করে জল নিয়ে, উনুনের আশপাশের চার-পাঁচটা পাথর ধুয়ে দিল, তারপর শালপাতা আর জংলী-কাঁটা দিয়ে গেঁথে গেঁথে অনেকগুলো দোনা বানিয়ে ফেলল। সেই বড় বড় পাতার দোনা পেতে দিল সেই পাথর-গুলোর ওপর।

আমরা সবাই হাত-মুখ ধুয়ে নিলাম ঝর্ণাতে—তারপর বসে গেলাম খেতে।

শিবব হাঁড়িটা কচি পাতা দিয়ে ধরে আমাকে ও ঋজুদাকে ঐ গাছের ডালের হাতা দিয়ে খুঁচিয়ে খিচুড়ি বের করে দিল।

ঋজুদা খুব অল্প খায়—অল্প একটু নিল ঋজুদা। আমার কিন্তু

দারুণ খিদে পেয়েছিল। আমি অনেকখানি নিলাম।

আমাদের দেওয়ার পর হাঁড়িসুদ্ধ নিয়ে শিব্ব আর ভীম বসে গেল।

খিচুড়িটা দারুণ হয়েছে—গন্ধ যা বেরোচ্ছে তা কি বলব! কিন্তু একবার মুখে দিতেই আমার কথা বন্ধ হয়ে গেল।

আমি মুখ নীচু করে আড় চোখে ঋজুদার দিকে তাকালাম।

দেখলাম, ঋজুদার মুখেও খিচুড়ি। খিচুড়ি গেলা হলে ঋজুদা আমার দিকে চেয়ে বলল, কেমন লাগছে? নিজের রান্না করা খাবার!



ঋজুদা হাসতে হাসতে বলল, উঃ-ই করো আর আঃ-ই করো, এখন পেটভরে খেয়ে নাও, নইলে সারারাত খিদেতে মরবে।

আমি জিভ বের করে বললাম, উঃ।

ঋজুদা হাসতে হাসতে বলল, উঃ-ই করো আর আঃ-ই করো, এখন পেটভরে খেয়ে নাও, নইলে সারারাত ক্ষিদেতে মরবে।

আমিই নুন দিয়েছিলাম, কিন্তু এত নুন দিয়ে ফেলেছিলাম যে একেবারে নুন-কাটা হয়ে গেছে। মোটে মুখে দেওয়া যাচ্ছে না।

শিব্বদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ওরা দুজনে বেশ তৃপ্তি করেই খাচ্ছে।

ঋজুদাও যেন বেশ তৃপ্তি সহকারে খেতে খেতে বলল, প্রথম প্রথম এরকম সকলেরই হয়। পরে আন্দাজ হয়ে যায়।

আমার বেশ লাগছিল। এই মাটির হাঁড়িতে খোলা-আকাশের নীচে গড়ের পাশে রান্না, পাথরে বসে পাথরের উপরে শালপাতার দোনায় খাওয়া। পশ্চিমে অস্তগামী সূর্য, পূবে অন্ধকার গুহা, মনের মধ্যে রাতের ভয়ের প্রতীক্ষা। দারুণ লাগছিল।

ঋজুদার সঙ্গে না থাকলে তো এতসব অভিজ্ঞতা হতো না।

ঋজুদা ইতিমধ্যে খাওয়া শেষ করে পাইপ ধরিয়েছে।

শিকারের পোষাক-পরা পাইপ-মুখে ঋজুদা একটা পাথরের উপর মুখ ফিরিয়ে বসে আছে। পশ্চিমাকাশের পটভূমিতে দারুণ দেখাচ্ছে ঋজুদাকে। দারুণ হ্যাণ্ডসাম্।

বড় হলে আমি ঋজুদার মতো হব। সমস্ত জীবন আমি এমনি করে পাহাড়ে জঙ্গলে কাটাব। এই জীবনের সঙ্গে কোলকাতার জীবনের কোনো তুলনা চলে? কত কী শোনার আছে, দেখার আছে এখানে; কত কিছু জানার আছে, ভাবার আছে; চাওয়ার আছে, পাওয়ার আছে। এই জীবনে আমার নেশা লেগে গেছে —বড় হলেও সারা জীবন এই জঙ্গল, পাহাড়, এই দুধ্‌লি ফুল, এই শাখায় শাখায় ঊর্ধ্বপুচ্ছ কাঠবিড়ালি—এরা সবাই আমাকে চিরদিন হাতছানি দেবে। আমার শরীরটা যেখানেই থাকুক, আমার মনটা পড়ে থাকবে এইরকম কোনো জঙ্গলে পাহাড়ে।

আমাদের খাওয়া শেষ হতে হতে বেলাও পড়ে এল। এখন বেশ শীত। আমরা হাত-মুখ ধুয়ে রাতের মতো তৈরী হয়ে নিলাম। ওয়াটার-বট্‌লে জল ভরে নেওয়া হলো।

তারপর আমরা সকলে সেই গড়ের ভিতরে ঢুকে বসলাম।

বারান্দার যে কোণটা পরিষ্কার করা হয়েছিল সেখানে বড় বড় কাঠের টুকরো এনে রেখেছিল শিব্ব আর ভীম।

বারান্দার পাশেই সারা রাতের মতো আগুন জ্বালাবার বন্দোবস্ত করা হলো, যাতে ভাল দেখা যায় এবং জংলী জানোয়ার না আসে কাছে।

এখনো অন্ধকার হয়নি। অন্ধকার পুরো হলে তখন আগুন জ্বালানো হবে। আয়োজন সব প্রস্তুত রয়েছে।

আমি একটা কাঠের গুঁড়িতে কম্বল বিছিয়ে আরেকটাতে হেলান দিয়ে আরাম করে বসেছি। খাওয়াটা একটু বেশী হয়ে গেছে। ঋজুদা বারান্দায় দাঁড়িয়ে গুহাটার দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কি যেন দেখছে। একবার দূরবীনটা চোখে লাগিয়ে দেখল। ঠিক তক্ষুনি শিব্ব আর ভীম বলল যে, ওরা আমাদের সঙ্গে এখানে থাকবে না রাতে।

শুনে আমার খুব রাগ হয়ে গেল, কিন্তু ঋজুদা হেসে বলল, তাহলে কোথায় থাকবি? এখানে থাকার আর জায়গা কোথায়?

ওরা বলল যে, এখান থেকে আধমাইল দূরে একটা পরিষ্কার গুহা আছে, সেখানে গিয়ে ওরা আগুন জ্বালিয়ে রাত কাটাবে।

ঋজুদা বলল, এখন তোদের আমি ছাড়তে পারি না—কারণ সন্ধে হয়ে এসেছে; এই সময় আধমাইল পথ যেতে যেতে রাত হয়ে যাবে। তোরাই বলিস যে সন্ধের মুখে এ জায়গা ভীষণ বিপদের জায়গা। এ ভাবে তোদের ছেড়ে দেওয়া যায় না। যদি যেতেই হতো তো অনেক আগেই তোদের যাওয়া উচিত ছিল।

এ কথাটা শুনে ওরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল, এবং বাইরের সায়ান্ধকারে বিস্তীর্ণ মাঠ, জঙ্গল আর পাহাড়ের দিকে চেয়ে নিজেরা

কি যেন বলাবলি করল। তারপর বলল যে, ওরা থাকতে পারে, কিন্তু গুহার দিকে মুখ করে থাকবে না—উল্টোদিকে মুখ করে বসে থাকবে।

ঋজুদা একটু বিরক্ত হয়ে বলল, তোদের যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে মুখ করে বসে থাকিস। তোরা ঘুমিয়েও থাকতে পারিস। কিন্তু এখান থেকে তোদের আমি আমার দায়িত্বে ছাড়তে পারব না। তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, জংলী জানোয়ারের ভয় ওরা করে না, কিন্তু অন্য ভয়ে হার্টফেলও করতে পারে।

এ কথা শুনে ওরা মহা খুশী।

ওদের দুজনের মধ্যে ভীম একটু সাহসী। ও বলল, ভয় আমি পাইনি, এই শিব্বটা পেয়েছিল, ও ঘুমোক। আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, বুঝলে সানোবাবু।

সানো মানে ছোট—তাই ওরা বলছে আমাকে সানোবাবু।

এর পর আর কোনো কথাবার্তা হলো না।

ঋজুদা কোমরের বেল্ট থেকে পিস্তলটা খুলে, ম্যাগাজিনটা বের করে গুলি সব ভরা আছে কিনা দেখে নিল, তারপর ঠেলে ম্যাগাজিনটাকে ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। ক্লিক্ করে একটা শব্দ হলো। তারপর হ্যাভারস্যাক থেকে আরেকটা গুলি-ভরা ম্যাগাজিন বের করে নিজের পকেটে রাখল।

সন্ধে প্রায় হয়ে গেছে। এখন চতুর্দিক অন্ধকার। কিন্তু বনে-জঙ্গলে অন্ধকার হয়ে যাবার পরও অনেকক্ষণ যে আলোর অস্তমিত আভাস থাকে তা স্থির হয়ে ফিকে গোলাপি ও বেগুনী রঙ ধরে জঙ্গল আর পাহাড়ের মাথা-ছোঁওয়া দিগন্তে কাঁপছে।

অন্ধকার সম্পূর্ণ হয়ে গেলে, ভীম গিয়ে আগুনটা জ্বালাল।

প্রথমে কিছু ভুস্‌ভুস্ শব্দ হলো পাতা পোড়ার, খড়কুটো পোড়ার ফুটফাট, তারপরই বড় কাঠে আগুন ধরার চট্‌পট্ আওয়াজ শোনা যেতে লাগল।

দেখতে দেখতে আগুনটা ধরে গেল।

ঋজুদা গিয়ে একটা আগুন-ধরা ডালকে নেড়েচেড়ে ঠিক করে বসাল আর অমনি আকাশে আগুনের ফুলঝুরি ফোয়ারার মতো লাফিয়ে উঠল।

এখন কোথাও কোনো শব্দ নেই, কিছু দেখার নেই। চতুর্দিকে জমাট-বাঁধা নয়, তরল অন্ধকার। আগুনের আলো যতদূর যায় ততদূর পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সেই বৃত্তের বাইরের অন্ধকারের রহস্য আরো বেড়ে গেছে।

আমি আগুনের দিকে চেয়ে তন্ময় হয়ে গেছিলাম। আমার আর কোনোদিকে খেয়াল ছিল না। আগুন যে এমন আরতি করে, আগুনের মধ্যে যে এত রঙ তা কোনোদিনও জানতাম না আগে। লাল, বেগুনী, গোলাপি, নীল আগুন যে প্রতিমুহূর্তে নিজেকে কত শত রঙে রঙীন করে তোলে তা আগুনের দিকে চেয়ে থাকলে বোঝা যায়। তার জিভ দিয়ে কোনো প্রাচীন সরীসৃপের মতো হিস্ হিস্ শব্দ বেরোয়, আর সে মাঝে মাঝে উল্লাসে লাফিয়ে উঠে আকাশ ছোঁয়ার চেষ্টা করে। সহসা রঙীন ফুলঝুরি তার সহস্র আঙুল হয়ে ভীমসেন যোশীর গানের মতো আকাশময় ছড়িয়ে পড়ে।

কতক্ষণ অমনি তাকিয়ে ছিলাম মনে নেই, হঠাৎ আমার হুঁশ হলো একটা আওয়াজে।

চমকে উঠে দেখলাম, ঋজুদা দাঁড়িয়ে উঠে গুহার উল্টোদিকের অন্ধকার মাঠের দিকে তাকিয়ে আছে।

সেখান থেকে যেন অনেকগুলো টি-টি পাখি ডাকছে উড়ে উড়ে, ডাকছে একসঙ্গে।

প্রথমে মনে হলো বোধ হয় দশ-বারোটা পাখি। তারপরই বুঝতে পারলাম, ওখানে কম করে একশ' পাখি ডাকছে। সমস্ত অন্ধকার মাঠ তাদের টী-টীর্-টি-টি্-টীটীর-টি-টি, ডিড্-ইউ-ডু-ইট্ আওয়াজে মুখরিত হয়ে উঠেছে।

ঋজুদা নিজের মনেই বলল, ইটস্ স্ট্রেঞ্জ, ইটস্ রিয়্যালি স্ট্রেঞ্জ্।

এমন সময় পাখিগুলো যেন একসঙ্গে কোনো রেসে নেমেছে এমনভাবে দল বেঁধে আকাশ জুড়ে আমাদের এই আগুনের দিকে উড়ে এল—আগুনে লাল আকাশটুকু ওদের পাখায় পাখায় ছেয়ে গেল—শূন্যে ওদের লম্বা লম্বা সরু সরু পাগুলো ঝুলতে লাগল, দুলতে লাগল। ওরা ঝাঁকে ঝাঁকে আগুনের কাছ অবধি উড়ে এসেই আবার ফিরে যেতে লাগল, আবার পরক্ষণেই দল বেঁধে উড়ে আসতে লাগল।

এমন সময় সেই গুহার মধ্যে হঠাৎ একটা আলো জ্বলে উঠল। আলোটা সাদা। বেশী এলুমিনিয়াম চূর্ণ দিয়ে বানানো রংমশালের আলোর মতো। আলোটা দপ করে জ্বলে উঠে কয়েক সেকেণ্ড থেকেই নিভে গেল।

এবার মাঠের শেষের জঙ্গলের ধার থেকে হাতীর বৃংহণ শোনা গেল। মনে হলো কোথা থেকে যেন এক বিরাট দলে ওরা এসে ওদিকে জমায়েত হয়েছে। যেদিকে 'মুনী' ছিল, সেদিক থেকে নানারকম হরিণের চীৎকার শোনা যেতে লাগল। কোট্‌রা, শম্বর, খুরান্টি, চিতল, নীলগাই সবাই এক সঙ্গে ডাকতে লাগল।

আমি ঋজুদার মুখের দিকে তাকালাম।

ঋজুদাকে বেশ বিস্মিত দেখাল, কিন্তু সেই বিস্ময়ে তাঁর এতই আনন্দ যে তাঁর ঠোঁটে একটা চাপা হাসি ফুটে উঠেছে।

আমার কিন্তু মোটেই হাসি পাচ্ছিল না।

আমি আমার টাঙ্গীটা পাশে রেখে সোজা হয়ে বসে রইলাম।

পেছনে তাকিয়ে দেখলাম, শিব্ব চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোবার চেষ্টায় নাক-মুখ ঢেকে শুয়ে আছে। আর ভীম একটা কাঠের উপর বসে টাঙ্গী হাতে করে আমাদের দিকে চেয়ে আছে।

হঠাৎ ঋজুদা আমাকে ডেকে নিয়ে আগুনের কাছে গেল। বলল, আগুনটা নিভাতে পারবি ?

আমি বললাম, কেন ?

হ্যাঁ, নেভাও।

আমি ওয়াটার-বটল্‌টা থেকে সব জল আগুনে ঢাললাম, কিন্তু অত বড় আগুন তাতে নেবে না।

ঋজুদা আমার হাত থেকে ওয়াটার-বটল্‌টা নিয়ে ঝর্ণার দিকে চলে গেল অন্ধকারে ; জল ভরে নিয়ে এল। এমনি করে তিন-চারবার জল ঢালল, আমি আমার টাঙ্গী দিয়ে জ্বলন্ত কাঠগুলো সরিয়ে আগুনটাকে আলগা করে দিলাম।

ততক্ষণে শিব্ব ঘুম থেকে উঠে আগুন নিভাতে দেখে খুব চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে। ভীম মুখে কিছু বলছে না, কিন্তু খুবই অসন্তুষ্ট।

ঋজুদা শিব্বকে ধমক দিয়ে চুপ করতে বলল।

আগুনটা নিভে আসতেই ঋজুদা আমাকে বলল, রুদ্র, ভিতরে চলে আয়।

আমি আর ঋজুদা দুজনেই গড়ের বারান্দায় উঠে এলাম।

চতুর্দিক থেকে তখনো নানারকম জানোয়ার ও পাখিদের চীৎকার শোনা যাচ্ছিল। আগুন নিভে যেতেই চতুর্দিকে যেন ঝড় উঠল।

টি-টি পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে ডাকতে ডাকতে গড়ের পাশ দিয়ে সেই গুহার মুখের সামনে গিয়ে পৌঁছল ; তারপর গুহার মুখের পাশে উড়তে উড়তে ডাকতে লাগল।

মাঝে মাঝেই হাতীর দলের বৃংহণ শুনতে পাচ্ছিলাম। এবার মনে হলো তারা যেন চলতে শুরু করেছে, এদিকেই আসছে যেন।

ঋজুদা বারান্দার কোণায় গিয়ে মুখ বাড়িয়েই ফিসফিস করে বলল, রুদ্র দেখবি আয়।

আমি ঋজুদার পাশ ঘেঁষে দাঁড়ালাম—বাইরে তাকিয়ে দেখি, তারার আলোয় ভরা শীতের আকাশের পটভূমিতে এক বিরাট হাতীর দল হেলতে-দুলতে এদিকে এগিয়ে আসছে। মাঝে মাঝে বড় হাতীগুলো দাঁড়িয়ে পড়ে শুঁড় তুলে পৃথিবী-কাঁপানো চীৎকার করছে।

এমন সময় হঠাৎ ভীম বলল, বাবু, সাপ!

আমরা চমকে পেছন ফিরেই দেখি, একটা তিন-চার হাত লম্বা সাপ বিদ্যুতের মতো ফণা তুলে গড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে নেভানো আগুনের পাশ দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ঋজুদাকে এবার একটু চিন্তিত দেখাল।

আমি ফিসফিস করে বললাম, ওটা কি সাপ?

ঋজুদা বলল, শঙ্খচূড়।

আমরা আর কথা না বলে, সবাই বারান্দার কোণায় একত্র হয়ে বসলাম।

ঋজুদা পিস্তলটা এবার হাতে নিল।

আমি ভয় পেয়ে বললাম, কি?

ঋজুদা বলল, কিছু না, যদি কেউ ঘাড়ে এসে পড়ে তাই। তারপর বলল, কথা বলিস না। গুহার দিকে তাকিয়ে থাক। যেদিকে সাদা আলো দেখা গেছিল সেদিকে নিশ্চয়ই কিছু দেখা যাবে।

একটু পরই আমাদের সামনের আকাশ কালো হয়ে অন্ধকার হয়ে গেল।

হাতীর দলটা গড়ের সামনের মাঠে এসে পৌঁচেছে। আমাদের দৃষ্টি আবদ্ধ। আমরা চুপ করে বসে রইলাম। ধীরে ধীরে ওরা সামনের মাঠ পেরিয়ে ঝর্নার পাশের ডালপালা ভাঙতে ভাঙতে গুহার দিকে যেতে লাগল।

অন্যদিক থেকেও নিশ্চয়ই হরিণ এবং অন্যান্য জানোয়াররা আসছিল। চতুর্দিকে এত বিচিত্র সব আওয়াজ হচ্ছিল তখন যে, কোন্‌টা কোন্‌ জানোয়ারের আওয়াজ তা বোঝার উপায় ছিল না কোনো।

টি-টি পাখিগুলো তখনো গুহাটার মুখের উপরে ঘুরে ঘুরে উড়ে বেড়াচ্ছে।

দশ-পনেরো মিনিট এমনিই চলল। সমস্ত আওয়াজ, জঙ্গল তোলপাড়—সব এখন পাহাড়ের দিকে। এমন সময় হঠাৎ আবার সেই

আলোটা দপ্ করে জ্বলে উঠল। এবং সমস্ত গুহা একটা চোখ ঝলসানো সাদা আলোয় ভরে গেল। আর কিছুই দেখা গেল না। আলোটা বোধহয় মিনিট খানেক রইল। তারপরই আবার যেমন হঠাৎ জ্বলেছিল, তেমনি হঠাৎই নিভে গেল।

হাতীগুলো আর ফিরে এল না এ পথে। ঐ পাহাড়ের তলা দিয়ে কোন্-না-জানি-কোন্ জঙ্গলে চলে গেল।

অনেকক্ষণ অবধি ঐ দিক থেকে জানোয়ারদের আওয়াজ আসতে শোনা গেল। তারপর আধঘটাখানেক পর সব চুপচাপ।

আবার ঝিঁঝির ডাক শোনা যেতে লাগল চারপাশ থেকে, আবার শিশির পড়ার শব্দ। উত্তেজনা নিভে গেলে, যার জন্যে প্রতীক্ষা করা তা দেখা শেষ হলে, বড় শীত করতে লাগল।

ভীম বলল, বাবু, আগুনটা জ্বালাই ?

ঋজুদা ঘড়ি দেখে বলল, মোটে সাড়ে আটটা বেজেছে এখন। এই শীতে সারারাত এখানে কষ্ট পেয়ে মরে কি লাভ ? চল, ক্যাম্পে ফিরে যাই।

শিব্ব আপত্তি করল ; বলল, এই রাত্তিরে যাবে বাবু ? কি দরকার ?

ঋজুদা বলল, চল্-না। হাতীরা তো ঐ দিকে চলে গেছে। ভয় তো হাতীদেরই। চল্ চল্, এখানে বসে ঠাণ্ডায় মরতে হবে।

আমার কিন্তু শুনেই দারুণ ভাল লাগল। এ এক দারুণ অভিজ্ঞতা। রাতের বেলায় এই গহন বনে এতখানি পথ হেঁটে-যাওয়া। কত জানোয়ারের ডাক, কত ফুলের গন্ধ, কত রাতচরা পাখির গান শুনতে শুনতে যেন এক স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্নময় সেতু পেরিয়ে ক্যাম্পে পৌঁছনো।

কতক্ষণ যে হাঁটলাম, তার হিসাব ছিল না। তবে এখন বরাবরই প্রায় উৎরাই। তাই খুব তাড়াতাড়ি আসা যাচ্ছিল। শীত যতই থাকুক, হাঁটতে হাঁটতে গা গরম হয়ে শেষে রীতিমত ঘাম হতে লাগল।

আশ্চর্য! অতখানি রাস্তা ঐ গভীর বনের মধ্য দিয়ে পেরিয়ে এলাম, কিন্তু দেখা হলো মাত্র একটা বিরাট বড় শজারুর সঙ্গে। আরো দেখা হয়েছিল একদল জংলী কুকুরের সঙ্গে। ভীম বলল, জংলী কুকুরের দল এদিকে ঘুরছে বলেই অন্য সব জানোয়ার সরে পড়েছে এ জঙ্গল থেকে।

আমরা যখন ঋজুদার ক্যাম্পে পৌঁছলাম তখন রাত দেড়টা।

পাহাড়ের উপর থেকেই নীচে ক্যাম্পটা দেখা যাচ্ছিল। আগুন জ্বলছিল বাইরে। হ্যাজাকটা ঝুলছিল বাঁশে। জীপটা দাঁড়িয়েছিল শিশুগাছের তলায়। ঘরের মধ্যে থেকে কমানো হ্যারিকেনের মিটমিটে আলো মাটির দেওয়ালের ফাটাফুটো দিয়ে বাইরে এসে পড়েছে।

বড় ভাল লাগল। ভাল লাগল সেই আশ্চর্য বনজ ও অপ্রাকৃত অভিজ্ঞতার পর; ভালো লাগল শীতের রাতে গরম বিছানার কথা ভেবে, মাথার উপর ছাদের কথা ভেবে; ভালো লাগল অন্য মানুষের সঙ্গর কথা ভেবে।

মহান্তী খিচুড়ি রেডি করে রেখেছিল ঋজুদার কথামতো।

শিব্ব ও ভীমকেও খেয়ে যেতে বলল ঋজুদা।

সে রাতে, আমার রান্না খিচুড়ির পর মহান্তীর রান্না খেয়ে এখন বুঝতে পারলাম যে, সে কতখানি ভাল রাঁধে।

॥ ৬ ॥

ঋজুদা দু'দিনের জন্যে কটকে গেছিল কি সব কাজে, কনসার্ভেটর অব ফরেস্টস্‌-এর সঙ্গে দেখা করতে।

আমাকেও বলেছিল সঙ্গে যেতে। কিন্তু আমি বলেছিলাম, দূর্‌, কটকে তো তুমি তোমার বন্ধুর বাড়িতে থাকবে—শহরে থাকতে আমার ভালো লাগে না। তুমি যাও, আমি এখানেই থাকি।

ঋজুদা বলেছিল, আমি যখন থাকব না, তখন জঙ্গলে একা-একা যেতে পারিস, কিন্তু একেবারে যেন একা বড় রাস্তা ছেড়ে যাস না। যদি যাস তো দুর্গা মুহুরীকে সঙ্গে নিয়ে যাস। অথবা অমৃতলালকে।

আমি শুধিয়েছিলাম, কেন? ভয় আছে?

ঋজুদা হেসেছিল; বলেছিল, এখনও ভয় আছে। তারপর বলেছিল, তুমি এখনও একা একা যাওয়ার মত শিকারী হওনি। হবে একদিন—যেদিন হবে সেদিন মানা করব না।

জীপে ওঠার সময় ঋজুদা বলেছিল, সাবধানে থাকিস; বাহাদুরী করিস না।

ঋজুদার অবর্তমানে এই দু'দিন আমি ক্যাম্পের এবং সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি-র মালিক হয়ে গেলাম।

তবে, মালিকেরও মালিক থাকে। ঋজুদা অমৃত্‌দাদাকে আমার লোকাল গার্জেন করে গেছিল। সে মাঝে-মধ্যেই হাঁক ছেড়ে আমার স্বাধীনতা খর্ব করত।

এর মধ্যে একদিন সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি কে-মিঠিপানি ঝর্ণাটায় চান করাতে নিয়ে গেছিলাম।

সে এক কাণ্ড।

কেউ জলে ডিগবাজী খেয়ে পড়ে যাচ্ছে, কেউ বা দৌড়ে সেই

প্রপাতের দিকেই চলে গেল। কেউ বা পাথরের খাঁজের মধ্যে, জল যেখানে বেশী, এমন ভাবে গা ডুবিয়ে বসল যে, দূর থেকে শুধু তার লেজটুকুই দেখা যেতে লাগল। ঝাঁপাঝাঁপি, চেঁচামেচি, ধাঁই-ধপ্পর করে আছাড় খাওয়া কিছুই বাদ রাখেনি তারা। আমার প্রায় পাগল হবার অবস্থা।

এক-একটিকে ধরে যেই আমি ডগ্-সোপ মাখাচ্ছিলাম গায়ে, অমনি অন্যরা আমার চারধারে হুড়োহুড়ি করছিল। সাবান মাখাই তার সাধ্য কি ?

আমি মুখ নীচু করে সারমেয়দের সংস্কারসাধন করছি, এমন সময় এক কাণ্ড হলো।

অনেকক্ষণ থেকে কতকগুলো মোষ মিঠিপানির অন্যপাশে জঙ্গলের মধ্যে চরে বেড়াচ্ছিল। তাদের গলার তামার ঘণ্টার শব্দ শোনা যাচ্ছিল অনেকক্ষণ থেকে ঘুট্উঙ্ ঘুট্উঙ্ করে।

হঠাৎ, বলা নেই কওয়া নেই, একেবারে বিনা নোটিশে একটা মোষ সোজা আমাদের দিকে শিং উঁচিয়ে তেড়ে এল। জানি না, কেন।

আমি সেদিন একটা লাল-রঙা শর্টস্ পরেছিলাম, তার জন্যেও হতে পারে।

মোষটা তেড়ে আসা মাত্র সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি সাতজনেই সাত স্বরের মত, সূর্যের সাত রঙের মত সাতদিকে জলের সঙ্গে ছিটকে উঠল, আর আমি জীবনে যত জোরে কখনো দৌড়ইনি ততজোরে প্রাণ নিয়ে দৌড়লাম।

কিন্তু মোষ বাবাজীও নাছোড়বান্দা।

তিনিও অজস্র কাঁটা, পাথর ইত্যাদি মাড়িয়ে আমার পিছনে হড়বড় হড়বড় করে ধেয়ে চললেন।

আমি জঙ্গলের মধ্যে ঝর্ণার পাশে, ঝর্ণার মধ্যে গোল হয়ে ঘুরতে লাগলাম ; সেও আমার সঙ্গে সঙ্গে মাথা নীচু করে গোল হয়ে ঘুরতে লাগল। সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি সকলে সমস্বরে

পেট কুঁচকে, মুখ উপরে তুলে ভেউ ভেউ করে হেঁচ্‌কি তুলতে লাগল। কিন্তু তাতে সেই মোটা মোষের কোনো ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

প্রাণের দায়ে মানুষ অনেক কিছু করে।

আমি প্রাণ বাঁচাতে দৌড়তে দৌড়তেই আমার শর্টস্‌-এর বোতাম খুলে ফেলে শর্টসটা ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালাম।

মোষ বাবাজী ভোঁস্‌ ভোঁস্‌ করে সেটার উপর কিছুক্ষণ নিঃশ্বাস ফেলে সেটাকে শিং-এ গলিয়ে নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে জঙ্গলের গভীরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

তখন আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করল। মেজদি পূজার সময় ঐ শর্টস্‌টা কিনে দিয়েছিল গতবারে। আরো কাঁদতে ইচ্ছা করল এই ভেবে যে, আমি এখন ক্যাম্পে ফিরব কি করে?

কিছুক্ষণ বোকার মত দাঁড়িয়ে থেকে, কতগুলো বড় পাতাওয়ালা সেগুনের ডাল সেগুন গাছের চারা থেকে ভেঙ্গে নিয়ে কোমরের কাছে আগে-পিছনে চেপে ধরে সা, রে, গা, মা, পা, ধা নি'র সঙ্গে দৌড়তে দৌড়তে এসে ক্যাম্পের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

ক্যাম্পে তখন কেউই ছিল না। শুধু মহান্তী কি যেন করতে রান্নাঘর থেকে বাইরে এসেছিল। মহান্তী আমাকে ঐ অবস্থায় দেখেই, আকাশের দিকে দু'হাত তুলে দুলে দুলে হাসতে লাগল।

আমি সভ্য হয়ে বাইরে বেরোতেই দেখলাম আমার দুরবস্থার কথা চতুর্দিকে রাষ্ট্র হয়ে গেছে। সকলেই মজা করছে আমাকে নিয়ে। তবুও, কি দারুণ বিপদে পড়েছিলাম, তা মহান্তীকে বললাম।

আমি যখন মোষ কি করে আমাকে তাড়া করল তার বর্ণনা দিচ্ছি, ঠিক তক্ষুনি আমাদের ক্যাম্পের পাশের পথ বেয়ে পাহাড়ের পাকদণ্ডী দিয়ে নেমে দুটি ছোট ছোট ছেলে গ্রামের দিকে যাচ্ছিল।

ছেলে দুটির বয়স আমার চেয়ে অনেক কম—। ভীতু ভীতু,

রোগা-পাতলা দেখতে। একজনের হাতে একটি বাঁশের লাঠি, আরেকজনের হাতে দুটো সাদা জংলী ইঁদুর। বোধহয়, কোনো গর্ত থেকে ধরেছে, খাবে আগুনে সেঁকে নুন লাগিয়ে।

মহান্তী ওদের কি যেন বলল ; বলতেই, ছেলেগুলো হাসি-হাসি মুখে আমার দিকে ঠাট্টার চোখে চেয়ে মিঠিপানির দিকে চলে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখি, ছেলে দুটো একটা বিরাট মোষের উপর বসে আমাদের ক্যাম্পের দিকেই আসছে। দেখি, মোষের কাঁধে আমার লাল শর্টস্‌টা মাফলারের মত ঝুলছে।

এই মোষটাই আমাকে তাড়া করেছিল কি না তা বুঝতে পারলাম না।

আমার মানিব্যাগে একটাকার নোট ছিল পঞ্চাশটা। আসার আগে দাদা দিয়েছিল। তার থেকে দুটো টাকা এনে ওদের দু'জনকে দিলাম। ওরা খুব খুশী হয়ে আবার মোষের পিঠে চড়েই জঙ্গলে উধাও হয়ে গেল।

এ মোষ নিশ্চয়ই ওদেরই গ্রামের।

ওদের চলে-যাওয়া দেখতে দেখতে আমার মনে হলো, এই ঘটনাতে আমার লজ্জারও কিছু নেই, ওদেরও বাহাদুরির কিছু নেই। জঙ্গলের মধ্যে মোষে তাড়া করলে খালিহাতে আমার ভয় লাগা স্বাভাবিক, অথচ ওরা মোটেই এসবে ভয় পায় না। হাতীতে তাড়া করলেও বাধহয় ওরা আমার মত ভয় পাবে না। আবার ওদের যদি কোলকাতায় গড়িয়াহাটের মোড়ে বিকেলবেলা নিয়ে গিয়ে রাস্তা পেরুতে বলা হয় তো এই ওরাই ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদতে থাকবে। আমি এবং ওরা অন্যভাবে মানুষ—ওরা জঙ্গলে আর আমি গ্রামে।

সেদিন দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর, বন্দুকটা কাঁধে নিয়ে, কয়েকটা গুলি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম একা একা।

এখন ঋজুদা নেই। অমৃত দাদাও নেই, আজ জঙ্গলে গেছে কাঠ লোড করতে। এখন আমি স্বাধীন।

অন্য সময়ের মত দুপুর বেলার জঙ্গলেরও একটা আলাদা জাদু আছে। শীতের মিষ্টি রোদ জঙ্গলের বুকের ভিতরে পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। সোনা আর সবুজে, হলুদে আর সোনাতে চতুর্দিক ঝলমল করছে।

জঙ্গলে পা বাড়ালেই আমার কেমন যেন ঝিম্ ধরে আসে—ভাল লাগার। নেশা করা কাকে বলে আমার জানা নেই, কারণ আমার কোনো নেশা নেই, চায়ের নেশাও নয়; কিন্তু মনে হয়, আমি যখন বড় হব, এই জঙ্গলকেই আমার নেশা করতে হবে।

জঙ্গলের পথে একা একা বন্দুক-কাঁধে অনেক কিছু নিজের মনে ভাবতে ভাবতে চলতে আমার কী যে ভাল লাগে সে আমিই জানি!

হাঁটতে হাঁটতে কতবার কল্পনায় বাইসন কি বাঘ মেরে ফেলি আমি, কতবার জঙ্গলের রাজার অদেখা রাজকন্যার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। কত কি কথা শুনি, কত কি গান। গাছেদের, পাখিদের, পোকা, ফুল, প্রজাপতি এমন কি আকাশ, বাতাস, পথের রাঙা ধুলো—এদেরও যে কত কি বলার আছে তা আমি নতুন করে বুঝতে পাই। বারে বারে ঋজুদার প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন নুয়ে আসে। মনে মনে বলি, তোমাকে ভালোবাসা ছাড়া দেবার মত আর কিছুই নেই আমার ঋজুদা—কারণ, আমি তো নিজেই এখনও বড় হইনি, লেখাপড়া শেষ করিনি। যখন আমার তোমাকে কিছু দেওয়ার মত সামর্থ্য হবে, তখন দেখবে, তুমি আমাকে যা দিয়েছ সেই অসামান্য দানের বিনিময়ে আমি তোমাকে কত সামান্যই দিতে সমর্থ হই। আমি জানি, তোমার কি কি পছন্দসই জিনিষ—পাইপ, বন্দুক, কলম, ভাল ভাল আনকোরা গন্ধের নতুন সব গাদা গাদা বই। তুমি দেখো ঋজুদা, দিই কি না তুমি দেখো!

ক্যাম্প থেকে একটু গেলেই মিঠিপানি পেরুতে হয়।

এখানে মিঠিপানি উপর থেকে ঝর্ণা হয়ে নীচে পড়েছে,

তারপর পথটার উপর দিয়ে গড়িয়ে গেছে। অথবা বলা যায়, পথটাই মিঠিপানির উপর দিয়ে গড়িয়ে গেছে।

নরম পেঁজা পেঁজা রাঙামাটির পথ।

পথের পাশে ছোট ছোট শালের চারায় টুঁই পাখি বসে পীটি-টুঙ্ পীটি-টুঙ্ পিটি-পিটি-পীটি-টুঙ্ করে শীষ দিচ্ছে।

পথের বাঁদিকে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। জঙ্গল কেটে একসময় হয়ত চাষাবাদ করত। এখন কি কারণে চাষাবাদ বন্ধ, তা জানি না। কিন্তু গত বর্ষার জল পেয়ে সমস্ত ফাঁকা মাঠটি এখন সবুজ ঘাস-লতায় ছেয়ে গেছে। মাঠের মধ্যে মধ্যে বেগুনী ফুল ফুটেছে থোকা থোকা। মাঠের এক পাশে একটা খড়ের তৈরী ভেঙ্গে-যাওয়া একচালা ঘর। অনেক বর্ষায় খড় ধুয়ে গেছে, খড়ের নরম হলুদ রঙ এখন কাল্‌চে হয়ে গেছে। ভেঙে-যাওয়া দরজার পাশে একটা না-নউরিয়া ফুলের গাছ ছাদের উপর হেলে রয়েছে। না-নউরিয়ার লাল রঙ সেই ক্ষয়ে-যাওয়া খড়ের ঘরের কালো পটভূমিতে, সেই নিস্তব্ধ দুপুরের রোদ পিছ্‌লানো চিকন সবুজ মাঠের রঙের সঙ্গে মিশে একটা দারুণ ছবি হয়েছে।

আমি অনেকক্ষণ একমনে সেদিকে চেয়ে রইলাম।

এই বনের পথে পথে এরকম কত শত দারুণ ছবি থাকে। চোখ থাকলে, সে-সব ছবি দেখা যায়; চোখ না থাকলে, শুধু পথের ধুলো, পথের কষ্টই চোখে পড়ে।

মনে আছে, একদিন ছুলোয়া শিকারের পর আমি আর ঋজুদা হেঁটে হেঁটে ক্যাম্পে ফিরছিলাম। ক্যাম্পের কাছাকাছি এসে পথের পাশে একটা ঝড়ে-পড়া বড় গাছের গুঁড়ির উপর আমি আর ঋজুদা বসেছিলাম। তখন সন্ধে হয়ে আসছিল। সমস্ত আকাশটাতে একটা অদ্ভুত গোলাপী আর বেগুনীতে কে যেন প্রলেপ বুলিয়েছিল। হঠাৎ আমার চোখ পড়ল, আমাদের সামনের একটা গাছে। গাছটা বেশী বড় ছিল না, এই দু'মানুষ সমান উঁচু হবে। গাছটার সব পাতা ঝরে গেছিল। শুকনো কালো ডালগুলো

সেই নরম স্বপ্নময় আকাশের পটভূমিতে কি যে এক ফ্রেমে-বাঁধানো ছবির সৃষ্টি করেছিল, কি বলব!

আমি অপলকে সেদিকে তাকিয়েছিলাম। মুখ তুলতেই দেখেছিলাম, ঋজুদাও সেদিকে তাকিয়েছিল। কিছুক্ষণ পর ঋজুদা আমার দিকে মুখ ফিরিয়েছিল। আমাদের চোখে চোখে একটা ইশারা হয়েছিল। দারুণ ইশারা।

দিদিদের সঙ্গে আমি অনেক আর্ট একজিবিশানে গেছি, কিন্তু এই সব ছবির সঙ্গে মানুষের আঁকা কোনো ছবিরই তুলনা হয় না।

সেই মাঠমতো জায়গাটা পেরুনোর পরই পথটা ঘন জঙ্গলে ঢুকে গেছিল। এখানে পথের পুরো অংশে রোদ পড়ে না। দু' পাশে বড় বড় প্রাচীন গাছ। ভিতরে নানারকম ঝোপ-ঝাড়, জঙ্গলের পর জঙ্গল—মাঝে মাঝে এক-এক ঝাঁক চিরুণী চিরুণী রোদ পাতার আড়াল ভেদ করে এসে পড়েছে। সায়ান্ধকার জঙ্গলের মধ্যে যেখানে যেখানে রোদ পড়েছে, মনে হচ্ছে সেই জায়গাগুলোয় যেন সোনা জ্বলছে।

নানারকম পাখি ডাকছে দু'পাশ থেকে। শীষ দিয়ে দিয়ে দোল খেতে খেতে ছোট ছোট মৌটুসী পাখিরা, বুলবুলিরা, মুনিয়া আর টুনটুনীরা এ ডাল থেকে ও ডালে, এ লতা থেকে ও লতায়, পাতা নাচিয়ে, লতা দুলিয়ে, লাফিয়ে লাফিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। ওদের উড়ে-যাওয়া শীষ আমার মনকে হঠাৎ হঠাৎ কোনো অদেখা অজানা অচিন্ পুরে হাতছানি দিয়ে যাচ্ছে।

কোথাও বা দিনের বেলাতেই ঝিঁঝি ডাকছে—সমস্ত জায়গাটা ঝিম্ ধরে আছে। গা শিরশির করছে।

আমার আগে আগে ঘুরে ঘুরে উড়ে চলেছে একটা বড় নীল কাঁচপোকা। তার ঘন নীল পাখ্‌নায় রোদের কণা লাগলেই রোদ ঠিক্‌রে উঠছে—সে বুঁ-উ-উ-ই-ই-ই-ই আওয়াজ করে আমার নাকের সামনে দিয়ে এক্কা-দোক্কা খেলতে খেলতে চলেছে।

কি একটা খয়েরী-মত জানোয়ার হঠাৎ পথের ডান পাশ থেকে বাঁ পাশে দৌড়ে গেল। ছোট জানোয়ার।

অভ্যাসবশে আমি বন্দুক কাঁধে তুলে ফেলেছিলাম।

জানোয়ার ভাল করে না দেখে মারার কথা নয়। কিন্তু এসব জানোয়ার এত দ্রুতগতি যে, আমার মত শিকারীর জন্যে তারা দাঁড়িয়ে থেকে ভাল করে চেহারা কখনোই দেখায় না।

জঙ্গলে যে-সব লোকের অনেকদিনের চলাফেরা, অনেকদিনের অভিজ্ঞতা, ঋজুদার মতে তারা জানোয়ার বা পাখি বুঝতে অত সময় নেয় না। তারা যে-কোনো জানোয়ারের গায়ের রঙ, চলন বা দৌড়ের ঢঙ, এবং পাখির ওড়ার লয় ও ভঙ্গী দেখেই একমুহূর্তে বলে দিতে পারে জানোয়ারটা বা পাখীটা কি। কিন্তু তেমন হতে আমার এখনও দেরী আছে।

জানোয়ারটা বাঁদিকের জঙ্গলে ঢুকে পড়ার পর আমি বন্দুক নামিয়ে ফেললাম। যখন বন্দুক নামালাম, তখন আমার মনে হলো, এ জানোয়ার যেন কোথায় দেখেছি। তার পরই মনে পড়ল, এর নাম খুরান্টি—ইংরিজীতে বলে, মাউস্-ডিয়ার। খুব ছোট্ট ক্ষুদে একরকমের হরিণ। ঋজুদার সঙ্গে একদিন ভোরের বেলায় দেখেছিলাম, ঋজুদা বলেছিল, এ জানোয়ার কখনও মারবি না, এদের বংশ প্রায় নির্মূল করে এনেছে সকলে মিলে। এখানকার জংলী লোকেরা জাল দিয়েও ধরে এদের। এদের মাংস কিন্তু দারুণ খেতে, জানিস্।

ভালই করেছি চিনতে না পেরে, নইলে এই খুরান্টি মেরে পরে ঋজুদার কাছে কানমলা খেতে হতো।

পথটা সামনেই একটা বাঁক নিয়েছে। বাঁকের মুখেই বড় বড় ঘাসে ভরা একটা ছোট মাঠ। বাঁক ঘুরেই দেখি হনুমানদের সভা বসেছে সেখানে। তাদের হাবভাব দেখে না হেসে উপায় নেই। কতরকম যে মুখভঙ্গী করছে, তা বলার নয়। লম্বা লম্বা লেজগুলো ছড়িয়ে বসে আছে কেউ। কেউ কেউ বা লেজ

পাকিয়ে গোল করে লেজ নিয়ে সার্কাস করছে।

আমাকে দেখে, পথের পাশেই যারা ছিল, তারা একটু নড়ে-চড়ে বসল শুধু। অন্যরা ভ্রূক্ষেপ মাত্র করল না।

ওদের পেরিয়ে প্রায় আরো আধমাইলটাক গিয়ে হুঁশ হলো, এবার ফেরার কথা ভাবা উচিত। কারণ এই গহন জঙ্গলে, যেখানে দিনের বেলাতেও লোকে একলা আসে না, এলে দলবদ্ধ হয়ে চলাফেরা করে, সেখানে সন্ধের মুখে আমার একা একা ঘুরে বেড়ানো বোকামির কাজ হবে।

ঋজুদার কাছে থেকে, তার সঙ্গে ঘুরে, একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে, কেউই একদিনে সাহসী হয় না; হতে পারে না। যারা বনজঙ্গলকে না চিনে, বনজঙ্গলের হালচাল আদব-কায়দা না জেনেই রাতারাতি বনে এসে সাহস দেখায় এসব ব্যাপারে, তাদের ঠাট্টা করে "বাহাদুর" বলে ঋজুদা।

ঋজুদা বোধহয় ঠিকই বলে, পৃথিবীতে কোনো কিছুই অত সহজে আর তাড়াতাড়ি শেখা যায় না। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সাহসী হতেও সময় লাগে।

অভিজ্ঞতার পর যে সাহস আসে, সেটাই সাহস, আর বাহাদুরির নাম হঠকারিতা। সেটাকে বলা উচিত সস্তা দুঃসাহস। এইসব জঙ্গল এমন একটা স্টেজ, এখানে এমন এমন সব থিয়েটার হয়, এমন এমন সব চরিত্র অভিনীত হয় যে, এখানে কোনো কিছুই "স্টেজে মারা" যায় না। রিহার্শাল না দিয়ে এখানে থিয়েটার করা বারণ।

যখন প্রায় ফিরব ভাবছি, ঠিক তখনই এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখলাম।

পথের পাশে, বাঁদিকে বড় বড় গাছের নীচে একটুখানি খোলা জায়গায় চার-পাঁচটি নীলগাই দাঁড়িয়ে আছে আমার দিকে মুখ করে। নীলগাইকে এখানের লোকেরা বলে "ঘড়িঙ"। সেই শীতের দুপুরের মেঘ-মেঘ ছায়ায় দাঁড়ানো নীল-ছাই রঙা

নীলগাইয়ের দল গাছ-গাছালির মাথা থেকে যে একটা বড় বলের মত গোল রোদ এসে পথে পড়েছিল, সেই দিকে চেয়েছিল। অন্ধকার আদিম বন থেকে ওদের আশ্চর্য চোখ তুলে এই সূর্যালোকিত বৃত্তর দিকে চেয়েছিল।

ওদের দেখেই আমিও 'স্ট্যাচু' হয়ে গেলাম।

আমাকে ওদের না দেখার কথা ছিল না—কিন্তু মনে হলো, ওদের দেখামাত্র আমি থমকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়াতে ওরা আমাকে দেখতে পেল না। আমি জলপাই-সবুজ শিকারের ক্যামোফ্লেজিং-রঙের পোশাক পরেছিলাম।

নীলগাইগুলো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, খেলতে শুরু করল। ওরা যেন কেমন ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে দৌড়য়—মোটা মেয়েরা দৌড়লে যেমন দেখায়, ওরা দৌড়লেও ওদের শরীরের পিছনটা অমনি ঝাঁকতে থাকে।

সে খেলা দেখার মত।

সেই ঠাণ্ডা, গা-ছম্‌ছম্‌, ভর-ভুক্কুরের বনে ওরা একে অন্যকে ধাওয়া করে করে সেই মাঠময় খেলতে লাগল। দূরে যেতে লাগল, আবার কাছে আসতে লাগল। এক একবার দলবদ্ধ হতে লাগল, দলবদ্ধ হয়ে পরক্ষণেই আবার দলছুট্‌ হতে লাগল।

কতক্ষণ যে ওরা এরকম খেলল জানি না।

আমার হঠাৎ হুঁশ হলো যখন আমার ঘাড়ে কার যেন ঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়া লাগল। সে ছোঁয়া আসন্ন রাতের।

জঙ্গলে ও পাহাড়ে শীতের বিকেলে রোদটা আড়াল হলেই, আলো সরে গেলেই, কার অদৃশ্য ঠাণ্ডা হাত যেন ঘাড়ে ও কানের পেছনে এসে চেপে বসে। তখন বুঝতে হয়, ঘরে যাবার সময় হয়েছে। আর দেরী নয়।

আমি ফেরবার জন্যে যেটুকু নড়াচড়া করেছি তাতেই বোধহয় নীলগাইয়েরা আমাকে নজর করে থাকবে। আমি, এই বিশ্বাস-ঘাতক দু'-পেয়ে একটি প্রাণী, যে ওদের এত কাছে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে

ছিলাম, তা যেন ওরা বিশ্বাসই করতে পারেনি। কিন্তু বিশ্বাস হতেই, সকলে একসঙ্গে প্রথমে তুল্কি চালে, তারপর দ্রুত গতিতে পাহাড়ে বনে খুরের দ্রুত খটাখট্ আওয়াজ তুলে আলোর সীমানা পেরিয়ে আধো-অন্ধকার দিগন্তে হারিয়ে গেল।

আমি ক্যাম্পের দিকে ফিরতে লাগলাম। বড় বড় পা ফেলে।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর দূর থেকে ক্যাম্পের শুঁড়ি পথ চোখে পড়ল।

ক্যাম্পের দিকে হাঁটতে হাঁটতে আমি মনে মনে বলছিলাম, ঋজুদা, তোমার কাছে আমি বার বার আসব। এই জঙ্গলে, কি অন্য জঙ্গলে; কিন্তু জঙ্গলে। যে-কোনো জঙ্গলে।

আসব শীতে, বসন্তে, গ্রীষ্মে, বর্ষায়, এমনকি হেমন্তেও।

মনে মনে বলছিলাম, ঋজুদা, এই স্বর্গ থেকে তুমি আমাকে তাড়িও না। কোনোদিনও তাড়িও না কিন্তু।